# ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

## শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

দ্বাবিংশ খণ্ড

স্বামী স্বরূপানন্দ রচনাবলী
NAME OF THE BOOK

| SL. NO | BENGALI | ENGLISH | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| 1 | অখণ্ড সংহিতা | AKHANDA SANHITA | 24 |
| 2 | অসংযমের মুলচ্ছেদ | ASAMJAMER MULLOCHED | 1 |
| 3 | আদর্শ ছাত্রজীবন | ADARSHA CHATRA JIBAN | 1 |
| 4 | আত্মগাঠন ও ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ | ATMAGATHAN O BRAHMACHARYA | 1 |
| 5 | আপনার জন | APNAR JAN | 1 |
| 6 | আয়ুর্বেদ চিকিৎসা | AYURVEDA CHIKITSA | 1 |
| 7 | বন পাহাড়ের চিঠি | BAN PAHARER CHITHI | 2 |
| 8 | বিধবার জীবন যজ্ঞ | BIDHABAR JIBAN JAGYA | 1 |
| 9 | বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য | BIHAHITER BRAHMACHARYA | 1 |
| 10 | বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ | BIBAHITER JIBAN SADHANA | 1 |
| 11 | দিন লিপি | DINA LIPI | 1 |
| 12 | ধৃতঙ্গ প্রেন্ন্যা | DHRITANG PREMNNA | 39 |
| 13 | গুরু | GURU | 1 |
| 14 | তাঁর পবিত্র বাণী | HIS HOLY WORDS | 1 |
| 15 | জীবনের প্রথম প্রভাত | JIBANER PRATHAM PRABHAT | 1 |
| 16 | কর্মের পথে | KARMER PATHE | 1 |
| 17 | কর্ম্ম ভেরী | KARMA VERI | 1 |
| 18 | কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে | KUMARIR PABITRATA | 6 |
| 19 | মন্দির | MANDIR | 1 |
| 20 | মধুমল্লার | MADHUMALLAR | 1 |
| 21 | মঙ্গল মুরলী | MANGAL MURALI | 1 |
| 22 | মুর্ছনা | MURCHANA | 1 |
| 23 | নবযুগের নারী | NABAJUGR NARI | 1 |
| 24 | নব বর্ষের বাণী | NABA BARSHER BANI | 1 |
| 25 | পথের সাথী | PATHER SATHI | 1 |
| 26 | পথের সন্ধান | PATHER SANDHAN | 1 |
| 27 | পথের সঞ্চয় | PATHER SANCHOY | 1 |
| 28 | প্রবুদ্ধ যৌবন | PRABUDDHA JOUBAN | 1 |
| 29 | সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ | SAMJAM PRACHARE SWARUPANANDA | 1 |
| 30 | সর্পঘাতের চিকিৎসা | SARPAGHATER CHIKITSA | 1 |
| 31 | সরল ব্রহ্মচর্য | SARAL BRAHMACHARYA | 1 |
| 32 | সংযম সাধনা | SANJAM SADHANA | 1 |
| 33 | স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব | STREE JATITE MATRIBHAB | 1 |
| 34 | সধবার সংযম | SADHABAR SANJAM | 1 |
| 35 | সাধন পথে | SADHAN PATHE | 1 |
| 36 | শান্তির বার্তা 3 খন্ডে | SHANTIR BARATA | 3 |
|  | মোট বহি | TOTAL | 105 |

ওঁ

# ধৃতং প্রেম্না

## দ্বাবিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৯

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—
—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী—১০

মূল্য ঃ পঁচাত্তর টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

.মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার) [2022]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স,
ডি ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-81-957962-5-0

ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"নগেশ চভব", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম, ● দূরভাষ- (০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মালটিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।



## শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-মন্ত্র-বাণী

[ বিভিন্ন পুস্তক ও প্রতিধ্বনি হইতে সঙ্কলিত। ]

১। ব্রহ্মচর্য্যই মহাশক্তির মূল উৎস।

২। ব্রহ্মচর্য্যই সকল তপস্যার মেরুদণ্ড।

৩। জগতের প্রত্যেক রমণী তোমার জননী।

৪। দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি।

৫। স্বাবলম্বনই শক্তিমানের পরিচয়-পত্র।

৬। নিষ্কলঙ্ক চরিত্রই যথার্থ সৌন্দর্য্য।

৭। কুসঙ্গই ভুজঙ্গ।

৮। নারীর সতীত্ব জাতির অমূল্য সম্পদ।

৯। সাধনাই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

১০। পরার্থই পরমার্থ, স্বার্থপরতাই আত্মহত্যা।

১১। পবিত্রতাই পূর্ণতা, নির্লোভতাই ঋষিত্ব।

১২। ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

১৩। জপের শক্র বহুমন্ত্র।

১৪। সত্যই জয়ী হবে, মিথ্যা নয়।

১৫। যার যার ইষ্টই তার তার কৃষ্ণ।

১৬। ধর্ম্মহীন ব্যক্তি আর পত্রহীন বৃক্ষ সমান শ্রীহীন।

১৭। আলস্যই তোমাকে ভিক্ষুক করিবে।



১৮। আলস্যই ভারতের জাতীয় শক্র।

১৯। ভগবৎ-সাধনা ব্রহ্মচর্য্যকে সুগম করে।

২০। সৎচিন্তা কখনও ব্যর্থ হয় না।

২১। নাম-সাধনই ভগবানের সহিত লগ্ন থাকিবার সহজতম পথ।

২২। ব্রহ্মচর্য্যই কর্ম্ম-সাধনার মেরুদণ্ড।

২৩। অসীম আসক্তিরই নাম বন্ধন-মুক্তি।

২৪। অনন্ত ভালবাসারই নাম মহানির্ব্বাণ।

২৫। জীবন মৃত্যুরই রূপান্তর।

২৬। মৃত্যু জীবনেরই দিগন্তর।

২৭। দুর্ব্বলতার সহিত আপোষ করিও না।

২৮। নির্ম্মল আত্মপ্রসাদই পুণ্যের নিরীক্ষক ও পরীক্ষক।

২৯। লক্ষ্য হোক্ ঈশ্বরের প্রীতি
—জীবে সেবা তাহার সাধন।
সেবারে রাখিতে নিষ্কলুষ
—স্বার্থহীন কর তনুমন।

৩০। যত ধূলি সব জান কান্ত-পদ-রেণু,
যত শিলা সব জান মহেশ্বর-তনু।
যত বাক্য সব জান বেদ-মন্ত্র-ধ্বনি ;
যত দুঃখ সব জান আনন্দের খনি।



৩১। বিশ্বের সবার স্বার্থমাঝে
—নিজ-স্বার্থ কর নিমজ্জন।
আত্মারে আত্মায় বলি দিয়া
—হোক্ তব আত্ম-প্রসারণ।

৩২। জীবনের পরম পরিপূর্ণতা জীবনের চরম আত্মোৎসর্গে।

৩৩। মনকে পরমেশ্বরে লাগাইয়া রাখ।

৩৪। কহিবে আনন্দ-ভরে নূতন বৎসর,—
"সবাই আপন মোর, কেহ নাহি পর।"

৩৫। স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়া জীবনকে মূল্যবান কর।

৩৬। তোমার জীবন সবার তরে
একার লাগি' নয়,
সবার কাজে জীবন ধ'রে
হও আনন্দময়।

৩৭। ধ্যানকে দাও ধ্বনি ;
বাক্যকে দাও মৌনতা।

৩৮। Speak silent ; Think aloud.
Near or far, mine you are.

৩৯। ছোট বড় সকলেরে,
বাসি ভাল প্রাণ ভ'রে।

৪০। Love for all,
great and small.



৪১। নিখিল বিশ্বকে আপন করিবার সাধনারই নাম হিন্দুধর্ম্ম।

৪২। যত দিবি, তত পাবি।

৪৩। So much given; so much gained.

৪৪। পিপীলিকা নহে ক্ষুদ্র,
তাহারেও ডাক তব কাজে,—
অনাদৃত কেহ যেন
নাহি রহে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে।

৪৫। সর্ব্বস্ব করিয়া দান তোমার চরণে,
তোমার হইতে চাহি জীবনে মরণে।

৪৬। তোমার যুদ্ধ মিথ্যার সহিত, মানুষের সহিত নহে।

৪৭। মহত্তের পূজা কর, মহৎ হইবে।

৪৮। যেই দিকে দিবে দৃষ্টি,
মিলন করিবে সৃষ্টি,
সবার তপ্ত হৃদয়-মরুতে
সান্ত্বনা কর বৃষ্টি।

৪৯। কলহের মত নিদারুণ নিষ্করুণ তস্কর আর কেহ নাই।

৫০। আসক্তির দাসত্ব অস্বীকার কর।

৫১। দেহ মন প্রাণ ভগবানের নামে লাগাইয়া রাখ।

৫২। যে ভগবানের যত প্রিয়, সে আমারও তত প্রিয়।

৫৩। কাহারও ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিও না, কিন্তু কাহারও বাধাতেই নিজ ধর্ম্মকার্য্য হইতে বিরত হইও না।

ধৃতং প্রেম্না

# দ্বাবিংশ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলি (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭২ সালের ''প্রতিধ্বনি''তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তাকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার দ্বাবিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র ''প্রতিধ্বনি''তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ''প্রতিধ্বনি''তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই ''ধৃতং প্রেম্না'' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ''ধৃতং প্রেম্না'' প্রথম হইতে একবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া ''ধৃতং প্রেম্না'' দ্বাবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—চৈত্র, ১৩৭২ বাংলা।

আযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়



৫৪। সংগ্রামই জীবনের সত্যতার পরিচায়ক।

৫৫। তোমার সাধনা নিখিল বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য।

৫৬। বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হও।

৫৭। চল এবং চালাও,—কর এবং করাও,—জাগো এবং জাগাও,—ইহাই তোমাদের হউক মূলমন্ত্র।

৫৮। শত্রু-মিত্র সকলেরে জানিয়া আপন,
সকলের হিতকর্ম্মে সঁপ তনুমন।

৫৯। ভয়-মুক্ত হোক্ আজি দেহ-মন-প্রাণ,
নির্ভয়ে কর্ত্তব্যে তব হও আগুয়ান্।

৬০। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতে সাধন,
কুণ্ঠাহীন চিত্তে দান করহ জীবন।

৬১। নারীর শক্তির বিকাশ ঘটাইবার প্রথম সোপান তাহার অক্ষত কৌমার্য্য।

৬২। পুরুষের শক্তির মূলভিত্তি তাহার কুমার-জীবনের ব্রহ্মচর্য্য।

৬৩। সর্ব্বকর্ম্মে মন রাখিবে পরমেশ্বরে। তাহার কৌশল শ্বাসে-প্রশ্বাসে এবং সকল শব্দে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ।

৬৪। সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তোমার জীবন ঈশ্বরময় হইয়া যাইবে।

৬৫। প্রতি কর্ম্মে নিজেকে ভগবানেরই সেবায় নিয়োজিত বলিয়া অনুভব কর।



৬৬। অহং যাঁহার মরিয়াছে, সে আত্মারাম হইয়াছে।

৬৭। ভালবাসাই জীবের স্বভাব।

৬৮। সংসার তাহার পক্ষেই মারাত্মক স্থান, যে ভগবানকে সহজেই ভুলিয়া যায়।

৬৯। সাহস, শৌর্য্য ও সংযম—এই তিনটীর একত্র সমাবেশ হউক তোমার চরিত্রে।

৭০। চিন্তা ও বাক্যে এক হও,
বাক্যে ও কর্ম্মে এক হও,
লক্ষ্যে ও গতিতে এক হও,
প্রেরণায় ও পরিণতিতে এক হও।

৭১। যে যত অক্রোধ, সে তত দীর্ঘজীবী।

৭২। মনুষ্য-জীবন সংগ্রামের জীবন।

৭৩। ক্ষুদ্র কাজকে যাহারা তুচ্ছ মনে করে না, বিরাট্ কাজ করিবার ভার তাহারাই পায়।

৭৪। দুঃখের মত বন্ধু নাই, কারণ তাহা নিত্যসুখের সন্ধান দেয়।

৭৫। প্রচার, সংগঠন ও সমাজ-মঙ্গলকর কাজের ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য।

৭৬। আমার যাহারা কর্ম্মী হইবে, তাহারা বিবাহিতই হউক, আর অকৃতদারই হউক, ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূল ভিত্তি রূপে ধরিয়া তাহাদিগকে চলিতে হইবে।



৭৭। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি ভালবাসা তোমাকে পরমেশ্বরের দিকে ঠেলিয়া দিক, এ ভালবাসা যেন তোমাকে অন্ধকূপে না হত্যা করে।

৭৮। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

৭৯। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্য্যাদা দাও, হেয়কে পূজা কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না।

৮০। নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও।

৮১। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্ম্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না।

৮২। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়।

৮৩। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল।

৮৪। জগজ্জোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব; হৃদয়ের প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া তাঁহাদের আকর্ষণ কর।

৮৫। জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও,—তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনায়ই সম্ভব হইবে।

৮৬। অলসকে কর্ম্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও,



দুশ্চিন্তাকারীর মনে সচ্চিন্তার সমাবেশ কর। ইহার চাইতে বড় জন-সেবা আর কিছু নাই।

৮৭। দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই ত' মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা।

৮৮। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে।

৮৯। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা, ব্যর্থতা।

৯০। ইন্দ্রিয়-সংযমের মতন কঠিন কাজ জগতে কিছুই নাই; এমন সহজ কাজও কিছু নাই।

৯১। সুখলাভ যখন তোমার নিজের জন্য, ইন্দ্রিয়-সংযম তখন অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

৯২। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য, তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ।

৯৩। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর, আত্মপ্রীতি নহে।

৯৪। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর।

৯৫। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা,—ইহাই যোগ।

৯৬। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় হইতেছে
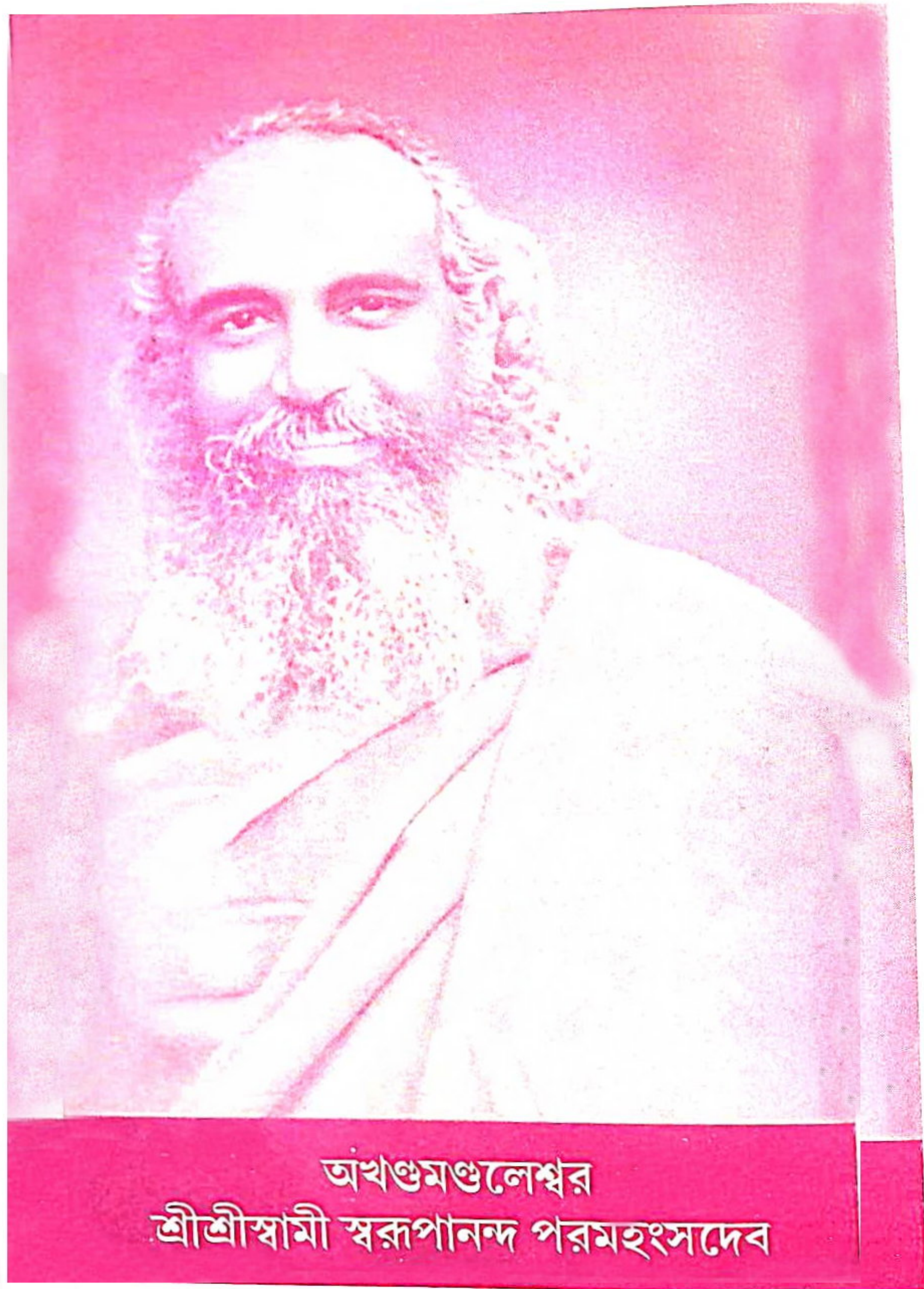
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

# ধৃতং প্রেম্না

## (দ্বাবিংশ খণ্ড)

### (১)

হরিওঁ

বারাণসী
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্রখানা পাইলাম। বিবাহ করিয়াছ সাত আট বৎসর কিন্তু কোনও প্রকারেই স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারিতেছ না। ইহা বিবাহিত জীবনের এক পরম সঙ্কট। কেন তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেছ না? কেন সে পিত্রালয়ে বাস করিতেছে? সে কি কুরূপা? কুরূপা বলিয়া কি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেছ না? কিছুকাল আগে আমি একটী মহিলাকে দেখিয়া আসিয়াছি যে কুরূপা। কিন্তু সংসারের সকলে প্রাণ ঢালিয়া তাহাকে ভালবাসিতেছে। গুণহীনা বলিয়াই কি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেছ না? সকলের পত্নীরাই যদি মহাগুণবতী হইবে, তাহা হইলে উনগুনারা কি চিরকুমারী থাকিবে? স্ত্রীর চরিত্রগত কোনও গুরুতর ত্রুটির জন্য যদি তাহাকে ভালবাসিতে না পারিয়া থাক, তবে অবশ্য তাহা ক্ষমার যোগ্য হয়।

কাহাকে কাহার ভাল লাগিবে, না লাগিবে, এই বিষয়ে সাধারণ একটা ধারণা না পাইয়া বয়স্ক পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া কোনও পিতামাতার উচিত নহে। তোমার পিতামাতা ঠিক সেই অনুচিত কার্য্যটি করিলেন দেখিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। বিবাহের সুফল বা কুফল প্রধানতঃ বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর উপরেই বর্ত্তে। তাহাদের ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, পছন্দ-অপছন্দ এবং সম্ভাবনা আর অসম্ভাবনা—সবই পিতামাতা বা বিবাহের নির্ব্বাচক-নিবর্বাচিকাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষ, বিলাত নহে। এইজন্যই তুমি পিতামাতার প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া পত্নীকে চিরবর্জ্জনের সেই পন্থা গ্রহণ করিতে পার না, যাহা সাম্প্রতিক আইন তোমাকে করিবার অধিকার দান করিয়াছে। কুরূপাকে রূপবতী করা যায় না, ইহা সত্য, কিন্তু তাহাকে গুণবতী হইবার সুযোগ দেওয়া যায়। বিদ্যার্জ্জনে অনেক অবাঞ্ছনীয়া নারী বাঞ্ছনীয়ত্ব লাভ করিয়াছে। সদুপদেশে অনেক অনাকর্ষণীয়া নারী জীবনকে আকর্ষণীয় করিতে সমর্থ্যা হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল কিন্তু অপ্রাপ্য নহে। একান্তই হতাশ হইবার যদি কারণ না থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তোমার স্ত্রীকে বিদ্যার্জ্জনাদি করিয়া যোগ্যতা বর্দ্ধনের সুযোগ দাও। তুমি তাহার সঙ্গ যদি সহ্য করিতে না পার, তাহাকে পিত্রালয়েই থাকিতে দাও, কিন্তু তাহার পেটে যাহাতে







ক-অক্ষর প্রবেশ করে, তাহা কর। বিদ্যা অনেককে অহঙ্কারে প্রমত্ত করে, ইহা সত্য কিন্তু অধিকাংশকে বিনয় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা দান করে। কোনও দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় জাতির ভিতরে শান্তিপ্রিয়তা আনিতে হইলে যে পেটে ক-অক্ষর ঢুকাইতে হয়, একথা খ্রীষ্টান মিশনরীরা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া জানেন এবং পার্ব্বত্য অঞ্চল সমূহে এতদ্বিষয়ক পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় তাঁহারা পূর্ণসফলতা অর্জ্জনও করিয়াছেন। তবে, এই বিরাট পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁহারা যে ধারাবাহিক প্রযত্ন চালাইতে পারিতেছেন, তাহার প্রধান কারণ যীশুখ্রীষ্টে তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস এবং প্রভু খ্রীষ্টের প্রিয়কার্য্য সাধনে জীবনোৎসর্গের মহান আদর্শবাদ। কিন্তু বিয়ে-করা একটা বৌকে নির্গুনা হইতে গুণবতী, অবাধ্যা হইতে অনুগতা, অপ্রিয়বাদিনী হইতে প্রিয়ম্বদা, অপ্রিয়কারিণী হইতে প্রিয়করী এবং অশোভনা হইতে সুশোভনা করিবার জন্য স্বামীর মনে ঐরূপ অফুরন্ত উদ্যম আসিবে কি করিয়া? সুতরাং তোমার আদর্শবাদের প্রয়োজন। শারীরিক, মানসিক বা সামাজিক সুখভোগের জন্য বিবাহ করিয়াছ, এই ভাবটা মনের মধ্যে না রাখিয়া, কন্যার পিতামাতা ভার বহিতে না পারিয়া একটা ঘাড়ের বোঝা রাস্তার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দূরে পলাইয়াছেন, আর তোমারই পদপ্রান্তে আসিয়া সেই দুর্ব্বহ বস্তাবন্দী জীবন্ত মাংসপিণ্ডটা পড়িয়াছে উদ্ধারের আশায়, অন্তরে মানবিকতার এই দায়িত্ববোধটুকুকে জাগাইয়া তুমি তাহার প্রতি নূতন দৃষ্টিতে

তাকাও। এইরূপ অসাধারণ স্বামী আমার চক্ষে দুই চারিজন পড়িয়াছে, যাহারা সুখের প্রত্যাশা করে নাই কিন্তু নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মনে সেবা দিয়া জন্তুজানোয়ারের মতন অবুঝ হিংস্র রুচিহীন অবাধ্য পত্নীকেও অহল্যা-উদ্ধারের মহিমা দেখাইয়াছে।

বিবাহ জীবনের একটা মস্ত ঘটনা কিন্তু জীবনকে কেবল জমা-খরচের দিক দিয়াই খতাইয়া দেখিও না। আদর্শ মানবেরা যোগ-বিয়োগের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া মানবিকতার প্রেরণায় লাভ-সম্ভাবনা-বিরহিত অনেক অভাবনীয় মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়া তোমার মতন বিপত্তিগ্রস্থ ও হতবুদ্ধি পথিকের পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উল্লিখিত কথাগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবে, তবে ত' নিজের মনকে তদনুরূপ গঠন দিবে! কথাগুলি বারংবার পড়। যখন বুঝিবে যে সত্যই বুঝিয়াছ, তাহার পরেও পড়। আমার যে কথাগুলিকে তোমরা অতি সহজ মনে করিয়া থাক, সেগুলি নিতান্ত সহজ নহে। আমি সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার জন্য কদাচ লেখনী ধরি না। অন্তরের স্বাভাবিক অনুভূতিকে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করি। অনুভূতির বস্তুকে অনুভব দিয়া যাচাই করিতে হয়। বুঝিয়া ফেলা আর অনুভব করা এক কথা নহে। অনেক কথাই অনেকে একটু চেষ্টা করিলে বুঝিয়া ফেলিতে পারে কিন্তু অনুভব সকলে করিতে পারে না। অনুভব করিবার জন্য সাধন চাই।





দীক্ষা ত' আমার নিকটে নিয়াছ। স্বেচ্ছায় আগ্রহে নিজের অন্তরের প্রেরণায় নিয়াছ। এখন সাধন কর। সংসারের নানা সমস্যা এতকাল তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ রাখিয়াছ, সাধন করিতে পার নাই কিন্তু নিজের পুরুষকারের বলে তুমি সাংসারিক দিক দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক আত্মনির্ভর হইয়াছ। সম্মুখে একটা এম, এ পাশ করার তাগিদ ছাড়া আর কোনও জটিল তপস্যা তোমার নাই। সুতরাং মনটাকে অতিমানব স্তরে লইয়া যাইবার জন্য এবার সাধনে মনোনিবেশ কর। চাকুরীও কর, এম-এও পড়, সাধনও চালাও।

যেই ব্যক্তি যেই গুরুরই শিষ্য হউক, আমার মতে, দীক্ষা নিয়া ফেলাটাই তাহার একটা চূড়ান্ত কৃতিত্ব নহে,—দীক্ষা নিবার পরে সাধন করা চাই। গুরুদেব তোমার মনের মাটিতে অমৃত-ফলের একটী বীজ পুতিয়া গেলেন, তিনি ত' তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। সূক্ষভাবে বা অশরীরী শক্তি দ্বারা তিনি যদি আরও কিছু করিতে পারেন বা করিতে চাহেন, ইহা ত' তাঁহারই দায়িত্ব। তোমার সাধন করিবার প্রয়োজন ইহাতে ফুরাইয়া যায় না। গুরুর দোহাই দিয়া তাঁহার উপরে নির্ভরের নাম করিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার যে cult বা ধর্ম্মীয় একনিষ্ঠা খুব সুপ্রচলিত দেখা যায়, ব্যক্তি-মানবের পক্ষে তাহার উপযোগিতা কোনও কোনও ক্ষেত্রে থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজ-বদ্ধ জীব যে মানবকুলে বাস করিবে এবং যাহাদের

পরস্পরের দোষগুণ পরস্পরের ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনে প্রভাব বিস্তারিত করিবে, সামাজিক সমৃদ্ধির ও উন্নতি-সম্ভাবনার অবারিত দ্বারের দিকে তাকাইয়া সেই মানবকুলে এই অলস-নির্ভরকে কোনপ্রকারেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

আমি চাহিনা যে, আমার একটী শিষ্যও সাধন না করিয়া অলস হইয়া কেবল গুরুর দোহাই দিয়া কাল কাটাউক। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আরও কিছু যাহা করিবার, তাহা আমি নিয়ত অফুরন্ত প্রযত্নে করিয়া যাইতেছি এবং এই দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবার পরেও আমি আমার পারমাত্মিক অস্তিত্বে তোমাদের জন্য অনন্ত-কোটি-কল্প-কাল সে কাজ করিয়া যাইব। কিন্তু তাই বলিয়া অলস তোমাদিগকে থাকিতে দিব না। সময় পাই না, অবসর হয় না, এসব কথা অচল। ভক্তিমান্ মুসলমানদিগের দিকে তাকাইয়া দেখ। তাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি কি প্রবল! ট্রেণ চলিতে চলিতে একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, প্ল্যাটফর্ম্মের উপরেই এক জায়গায় বসিয়া গেলেন ভক্ত-সাধক নমাজ পড়িতে। ট্রেণ হুইস্‌ল দিলে ছুটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীতে জায়গা থাকিলে সেইখানেই বাকী নমাজটুকু পড়িতেন কিন্তু ট্রেণ যাত্রীতে বোঝাই। নমাজের জায়গা ছিল না। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই আবার গামছা হাতে নামিলেন প্ল্যাটফর্ম্মে। এভাবে তিনি দুই তিন ষ্টেশনে তাঁহার নমাজটি সম্পূর্ণ করিলেন। নমাজটি শেষ করিয়া ট্রেণে উঠিবার সময়





দেখিলাম তাঁহার চোখে মুখে প্রশান্ত দীপ্তি, যাহা ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ সুফল।

ভক্ত মুসলমান নমাজের সময়টি আসিলে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া নমাজ পড়িতে লাগিয়া যান। অফিসে, আদালতে, সভায়, সমিতিতে, ট্রেণে, ষ্টীমারে, দিনে বা রাত্রিতে প্রায় কোনও অবস্থাতেই ইহার ব্যত্যয় হইতে দেন না। এই নিষ্ঠা তাঁহাদের কোথা হইতে আসিল? বিশ্বাস হইতে। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে সম্পূর্ণতঃ বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের মধ্যে ফাঁক নাই, ছেদ নাই। তোমরা যখন বল, সাধন করিতে বসিবার তোমাদের সময় হয় না, তখন তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে এবং প্রকারান্তরে ইহাই বল যে, গুরুবাক্যকে এবং গুরুদত্তসাধনে তোমাদের বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস থাকিলে সময়াভাব, অনবসর বা অন্যান্য পাঁচ দশটা ওজুহাত আসিয়া তোমার আর পরমেশ্বর-সাধনার মাঝখানে ঢু মারিতে পারিত না।

বিশ্বাস কিসে আসে? বিশ্বাস আসে পরমেশ্বরের কৃপায়। তিনি বিশ্বাস না দিলে কেহ বিশ্বাসবান্ হইতে পারে না। কিন্তু সাধন করিতে করিতেও বিশ্বাস আসে। এই সদুপায়টিও তাঁহারই দয়ার দান। বিশ্বাসবান্ সৎলোকের সঙ্গদ্বারা বিশ্বাস আসে। বিশ্বাসী মহৎ লোকের চরিত্র-চিন্তনের ফলে বিশ্বাস আসে। যাহা করিলে বিশ্বাস আসে, তাহা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

বারাণসী

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ছোট জায়গার এবং বড় জায়গার গুণাগুণের পার্থক্য থাকে। এ পার্থক্যের মূল কারণ পরিস্থিতি জাত। বড় বড় শহরে বন্দরে নিয়ত গুণী জ্ঞানী মহৎ লোকদের আগমন হইতেছে। ছোট ছোট জায়গায় কালেভদ্রে উচ্চকোটির লোকেরা আসেন। ফলে বড় জায়গার লোকের মধ্যে কতকগুলি বড় গুণ দেখা যায়। আবার ছোট জায়গাগুলি প্রকৃতির কোলের শিশু। নাগরিক কৃত্তিমতা সেখানে অল্প। এইজন্য সেখানের মানুষ সাধারণত সরল এবং সহজ-বিশ্বাসী হয়। সুতরাং ছোট জায়গারও বড় গুণ আছে, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

তুমি একটা ছোট জায়গায় আছ। ছোট জায়গার অশিক্ষা-জনিত কুসংস্কার এবং কুশিক্ষাজনিত সঙ্কীর্ণতা তোমাকে সূচীবিদ্ধ করিয়া বিরক্ত করিতেছে। কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। জানিতে হইবে যে, প্রত্যেকটী মানুষের ভিতরে পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন; পূজার মতন পূজা করিতে পারিলে, সেবার মতন সেবা দিতে জানিলে প্রত্যেকের ভিতরের সুপ্ত ভগবান জাগিয়া উঠিবেন।

"হে প্রভো জাগো", এই আকূতি লইয়া প্রত্যেকটী





মানবাত্মার সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার কত কুশিক্ষা আর অশিক্ষা, তাহার কত কুসংস্কার আর সঙ্কীর্ণতা, তাহার কত অযোগ্যতা আর অক্ষমতা, তাহার দিকে না তাকাইয়া তুমি তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে উৎফুল্ল-নয়নে তাকাও।

যাহাদিগকে সাধনকর্ম্মে সঙ্গীরূপে পাইয়াছ, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই ব্যাপারে উৎসাহী নহে দেখিয়া বিচলিত হইও না। নিজের অন্তরের উদ্দীপনা দিয়া তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা চালাইলে শ্রম তোমার বিফল হইবে না।

আদর্শের পতাকাতলে পরমোল্লাসে আসিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল পরেই পশ্চাদপসরণ করিয়াছে এবং যাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাহাকেই গর্হণ করিয়াছে নিমেষের মনোবৈকল্যে,—এই সকল দৃশ্য দেখিয়া বিচলিত হইও না। অবিরাম পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা ঘটিতেছে এবং চিরকাল ঘটিবে। তোমাকে উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে না। তোমাকে তোমার পতাকাতলেই অফুরন্ত অগ্নিবর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। নিজ সাহস, শৌর্য্য ও অকুতোভয়তা কিছুতেই তুমি বিসর্জ্জন দিতে পার না। চতুর্দ্দিকে আত্মবিস্তার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তোমাকে আত্মস্থ হইতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুকূল রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকস্থ আরও দশ পাঁচজন চরিত্রবান্ নরনারীকে আত্মস্থ হইবার সাধনায় ব্রতী করিতে হইবে। সাধন-

পথে একাকিত্ব ঘুচাইবার জন্য সঙ্গী সংগ্রহ করা কদাচ দোষাবহ নহে। সৎপথে সমপন্থী সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে পুণ্য কার্য্য।

অতীতে যেই সকল স্থলে দাগা খাইয়াছ, তাহার কথা স্মরণ কর। অতীতের প্রত্যেকটী অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা তোমার আত্মশক্তি-প্রবোধনের সহায়ক হউক। একাকিত্ব যে দুর্ব্বলতা বা আত্মাবজ্ঞা সৃষ্টি করিয়াছে, সমপন্থী সাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা তাহা দূর করিবার চেষ্টা কর। বলবৃদ্ধিই আসল উদ্দেশ্য, দলবৃদ্ধি নহে। দল বাড়াইয়া অনেকে ঐহিক কুশল বাড়াইয়াছে কিন্তু নৈতিক কুশল হারাইয়াছে।

উচ্চ কণ্ঠে যাহারা দ্রোহবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, তাহাদের অনেকে যে স্বল্পকাল মধ্যে তোমার সহকারী, সহকর্ম্মী এবং অনুপন্থীও হইতে পারে, এই বিশ্বাস রাখিও। শত্রুভাবে কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। মিত্রোচিত প্রেম লইয়া বিরুদ্ধবাদী, বিরুদ্ধকারী, বিরুদ্ধধর্ম্মী প্রত্যেকের প্রতি কোমল দৃষ্টিতে তাকাইও।

মুষ্টি-মধ্যে অমৃতভাণ্ড পাইয়াও যাহারা উপেক্ষায় ফেলিয়া দিয়া নিম্বরসে আসক্ত হইয়াছে, গ্লানিকর বাক্যোচ্চারণ করিয়া তাহাদের মনে দুঃখ দিও না। সর্ব্বপ্রকার অধঃপতন হইতে তাহাদিগকে টানিয়া তুলিবার জন্য তোমার অন্তরের প্রেমকে সহস্রগুণ, লক্ষগুণ, কোটিগুণ ব্যাপক, গভীর ও নিষ্কলঙ্ক করিতে হইবে।

অপাত্রে মহাবস্তু দানকে বানরের গলায় মুক্তার হার







পরানোর তুল্য বলা হইয়া থাকে। সুতরাং অবিরাম জ্ঞান বিতরণ করিয়া এমন কর, যেন ত্রিভুবনে একটীও অপাত্র না থাকিতে পারে, নিতান্ত অধম পতিতেরাও যাহাতে সুপাত্রে পরিণত হইয়া যায়। ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। শ্রম কর এবং প্রতীক্ষা কর। কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রত্যাশা করিওনা। যে কাজ যত মহৎ, তার সুফল ফলিতে তত দেরী। অটুট বিশ্বাস রাখিয়া সাহসোন্নত বক্ষ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাক।

যে সমাজেই যাও, তাহার তরুণেরাই তাহার ভবিষ্যৎ। তরুণদিগের মধ্যে কাজ সুরু কর। তরুণদিগকে উপেক্ষা করিও না। তাহাদের কল্পনাশক্তিকে তোমাদের আদর্শের পানে আকৃষ্ট কর। তাহাদের কর্ম্মচঞ্চল বাহুগুলি তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আন্দোলিত হউক। তাহাদের যৌবনের উচ্ছ্বাস ও আবেগ তোমাদের সুপুষ্ট চিন্তাধারাকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলুক। তরুণদিগকে তোমরা তোমাদের সম্পদ বলিয়া স্বীকার কর। বৃদ্ধেরা মোহজালে বদ্ধ হইয়া আত্মবিশোধনে অক্ষম হইতেছে। তাহাদিগকে মুক্তিদান কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হউক তরুণের দল।

তরুণদিগকে পূজা করিতে যাইয়া আমি আমার জীবনে অনেক অসাফল্য বরণ করিয়াছি। ইহারা চঞ্চল, অস্থিরমতি, ইহারা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল এবং অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। ইহারা

অল্প আদরে গলিয়া পড়ে, স্বল্প অনাদরে অভিমানাহত হইয়া প্রলয়-কাণ্ড ঘটায়। এগুলি তারুণ্যের স্বভাবধর্ম্ম হইলেও এসব উহাদের গুণ নহে,—দোষ। ইহাদিগকে সর্ব্বদোষ-মুক্ত করিয়া ইহাদের তারুণ্যকে স্থিতপ্রজ্ঞ করিতে হইবে। প্রাচীন ঋষিরা যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য তরুণকে স্বভাবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করা নয়,—তাহাকে তাহার স্বধর্ম্মে থাকিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ করা। অতীত চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার শিক্ষা রহিয়াছে। সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাও।

একদা আমি যে কাজটুকু দেশের একাংশ জুড়িয়া করিয়াছি একক প্রচেষ্টায়, আজ তোমরা সে কাজটুকু করিতে বদ্ধপরিকর হও সদলবলে এবং সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া। যে কাজ আমি নিজে করিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে করিতে বলিতেছি। যে কাজ আমি করি নাই এবং যাহার শুভফল প্রত্যক্ষ হয় নাই, তেমন কার্য্যে তোমাদিগকে প্রণোদিত করিতেছি না। সংঘ, সম্প্রদায় বা সমাজ-বিশেষের দিকে তাকাইয়া নহে, সমগ্র মানব-জাতি এবং তাহাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তোমরা কাজ কর। কাজ যদি কর, অনন্তকাল আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**





**(৩)**

হরিওঁ বারাণসী
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার বহু দুঃখের বারতা শুনিলাম। কিন্তু হতাশ হই নাই। তুমি নিঃস্বার্থ ভাবে চেষ্টা করিয়াও একটা ষ্টেশনের দুর্নীতি দূর করিতে পার নাই, আর তাহারই জন্য নিজেকে লোকচক্ষে হেয় মনে করিতেছ, ইহা তোমার মনের দুর্ব্বলতা মাত্র। এই যুগে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া কেহ লোকচক্ষে হেয় না, আর তুমি কদর্য্য, কুৎসিত আবহাওয়াকে ন্যায়ানুকূল করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হেয় প্রতিপন্ন হইবে? হয়ত উপরওয়ালারা তোমার উপর খুশী হন নাই কিন্তু তাহাদ্বারা তোমার সততা বা যোগ্যতা খণ্ডিত হয় না। সরল মনে, নিঃস্বার্থ চিত্তে, নিষ্কাম প্রেরণায় অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়াকে পরিচ্ছন্ন করিতে গিয়াছিলে কিন্তু সহকর্ম্মীরা তোমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহা তোমার সহকর্ম্মীদেরই দুর্ভাগ্য, তোমার নয়। চতুর্দ্দিক অসত্যের বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়াও যাহারা অকুতোভয় অন্তরে অন্যায়কে সংশোধন করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা নিন্দনীয় নহে, পূজার্হ।

যখন যেখানেই যাও, পরমেশ্বরের পবিত্র নাম কদাচ ভুলিও না। সহস্র অশান্তির মধ্যেও নামের সেবা করিয়া শান্তি আহরণ

কর। নাম শান্তির আধার। নাম শান্তির আগার। নাম শান্তির আশ্রয়। সহস্র সংগ্রামের মধ্যেও নাম তোমার পরমশান্তিদাতা হউন। নামের সেবার মধ্য দিয়া অফুরন্ত প্রেম আর অকুণ্ঠ আনন্দ অর্জ্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৪)

হরিওঁ

বারাণসী

১৯শে শ্রাবণ,১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

তোমরা একটী প্রতিনিধি-সম্মেলন করিতে যাইতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

মনে রাখিও, সম্মেলন বক্তৃতা শুনিবার জন্যও নহে, বক্তৃতা দিবার জন্যও নহে। সম্মেলন কাজ করিবার জন্য। কি কাজ তোমরা করিতে চাহ, আগে তাহা স্থির কর। যে কাজ করিতে চাহ, তাহা কতদিনের মধ্যে সমাপন করিবে, তাহাও স্থির কর। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাজ আদায় করিয়া নিবার জন্য যে-কথা কহিতে হইবে, যতটুকু কহিতে হইবে, যে-কথা শুনিতে হইবে, যতটুকু শুনিতে হইবে, মাত্র ততটুকুই কহিবে এবং ততটুকুই শুনিবে। বক্তৃতা শুনিতে বা শুনাইতে হইলে মাঠে যাও, সম্মেলনের আসর তোমাদের স্থান নহে। সম্মেলনের





উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে ভাব-প্রচার নহে। সে উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য প্রকাশ্য জনসভা সঙ্গত। সম্মেলন-মঞ্চে দাঁড়াইয়া যাঁহারা জনসভার বক্তৃতা দিবেন, আর জনসভার মঞ্চে দাঁড়াইয়া যাহারা সম্মেলনের কর্ত্তব্য করিতে চাহিবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তোমরা তোমাদের কোনও সম্মেলনের মাঝখানে, এই ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিও না। ছাকা ছাকা কথা বল, ছাকা ছাকা কথা শোন। এই প্রতিজ্ঞা লইয়া কথা বল যে, যে-টুকু বলিবে, সে-টুকু অন্যকে দিয়া পালন করাইতে হইবে, আর যে-টুকু শুনিবে সে-টুকু নিজেরা পালন করিবে। এযেন ভোজ-সভা,—পাশ্চাত্য নহে, প্রাচ্য। যে পরিবেশন করিবার, সে একটার পর একটা জিনিষ পাতে ফেলিয়া যাইবে, যে ভোজন করিবার, সে একটার পর একটা মুখে দিবে, চিবাইবে আর গলাধঃকরণ করিবে। পরিবেশক যদি বক্তৃতাবাজিতে মন দেয়, তাহা হইলে ভোক্তার পাতে কিছুই পড়ে না। ভোক্তা যদি হাঁ করিয়া কেবল পরিবেশকের ওষ্ঠ, গুম্ফ আর চক্ষুবিস্ফারণ দেখিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার আর ভোজন হয় না। সম্মেলনে আসিয়াছ কর্ম্মপন্থা দিতে এবং গ্রহণ করিতে,—বিদ্যা জাহির করিতে নয়, নিজের মহত্ব প্রচার করিতেও নহে। সম্মেলনে আসিয়াছ অপরেরা কি ভাবে কাজ করিয়াছেন, কিভাবে সফল হইয়াছেন, কেনই বা অসফলতা বরণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে, তাহা হইতে শিক্ষা সংগ্রহ করিতে এবং সেই শিক্ষাকে কাজে লাগাইতে।

মণ্ডলীগুলি তোমাদের গুরুবিগ্রহ। মণ্ডলীর প্রতিনিধি তোমাদের গুরুদেবের প্রতিনিধি। বিভিন্ন মণ্ডলী একই গুরুদেবের বিভিন্ন বিগ্রহ। বিভিন্ন প্রতিনিধি একই গুরুদেবের বিভিন্ন প্রতিনিধি,—কেহ মান্য আর কেহ নগন্য নহেন। সকলেই দামে ভারী, ওজনে সমান। যতক্ষণ তিনি অহং-প্রমত্ত না-হইতেছেন এবং নিজেকে গুরুদেবের প্রতিনিধি জানিয়া, বিচার করিয়া, হিসাব করিয়া, সন্তর্পণে অর্থযুক্ত বাক্য বলিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার বাক্য গুরুবাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধেয় হইবে। প্রত্যেক প্রতিনিধি কথা কহিবেন শুধু এই একটী উদ্দেশ্যে যে, কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় জরুরী কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপন করিবার সুষ্ঠুতম পন্থা বাহির করিতে হইবে।

সম্মেলনে প্রতিনিধি ব্যতীত যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদিগকে বিনম্র চিত্তে অবস্থান করিতে হইবে, শৃঙ্খলা মানিতে হইবে। সম্মেলন যখন বিশেষ ভাবে কর্ম্মপন্থা আবিষ্কারের বৈঠক, তখন ইহাতে জনসাধারণকে আহ্বান করা অনুচিত। সৎকাজেও মন্ত্রগুপ্তির প্রয়োজন। নতুবা কাজে বিঘ্ন হয়। মন্ত্রগুপ্তির মহিমা যাহারা জানে না বা স্বীকার করে না, তাহাদের মধ্যে জগতে সফল কর্ম্মী কদাচিৎ দেখা যায়। ইষ্টমন্ত্র জগতের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র বস্তু। তবু তাহা লোকে গোপনই রাখে। কর্ম্ম-সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও মন্ত্রগুপ্তি অত্যন্ত আবশ্যকীয়।

কেহ কেহ সম্মেলনের দিনে আরও দু'পাঁচটা ভারী ভারী কর্ম্মতালিকা রাখে। যথা,—আবৃত্তি-অনুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান বা





অভিনয়। ইহার ফলে সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরা ঐ সকল কাজে ব্যস্ত হইয়া রহে। ফলে, না পারে সম্মেলনকে সাফল্যলাভে কোনও সেবা দিতে, না পারে নিজেরা কোনও বিশেষ লভ্য সংগ্রহ করিতে। বাহিরের জনতার জন্য যে শ্রম, সম্মেলনের ক্ষেত্রে তাহা পশুশ্রম।

কেহ কেহ সম্মেলনকে মহোৎসবের রূপ দিয়া থাকে। সব কাজ শিকায় উঠিয়া যায়। খিচুড়ী-ভক্ষণ এবং হরিনাম-কীর্ত্তন ছাড়া বাকী সব কাজ বিচিত্র চরিত্রের জনতার অবিশ্রান্ত যাতায়াতে চাপা পড়িয়া যায়। শ্রান্তি হয়, ক্লান্তি হয়, অর্থব্যয়ের চূড়ান্ত হয় কিন্তু সম্মেলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

সম্মেলন করিতে হইলে কি কি জটিলতা হইতে সম্মেলনকে মুক্ত রাখিবার জন্য সতর্ক থাকিতে হইবে, স্থানীয় পরিস্থিতি-বিবেচনায় তদ্বিষয়ে যথেষ্ট বুদ্ধি-সঞ্চালন প্রয়োজন। সম্মেলনের মূল লক্ষ্যের সহিত যেই ব্যক্তির বা যেই জনসমূহের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই, কেবল লোকদেখান ভদ্রতার জন্য তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া "অব্যাপারেষু ব্যাপারম্" করিবার সুযোগ দান করা উচিত নহে। সম্মেলনের মধ্যে সঙ্গীতের পর সঙ্গীত আর বাজনার পর বাজনা সমাবিষ্ট করিয়া ইহাকে মনোহারী করিবার চেষ্টাও মূর্খতা। গান-বাজনার আমদানী হইলে বাহিরের লোক আটকাইয়া রাখিবে কি করিয়া? প্রারম্ভ-সঙ্গীত আর সমাপ্তি-সঙ্গীত থাকিতে পারে কিন্তু সম্মেলনমঞ্চ যদি হরিনাম-কীর্ত্তনে মুখরিত করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে

সম্মেলন-স্থানটী জনসভায় পরিণত হইয়া যাইতে কত দেরী? নিজেদের ঘরোয়া কথা, নিজেদের সুখদুঃখের বার্ত্তা, নিজেদের নানা জটিল সমস্যার বিষয়ে যেখানে বলিবে ও শুনিবে, সেখানে অন্যতর ব্যাপার কেন?

সম্মেলনের স্থান শুচি হইবে, শুদ্ধ হইবে, সুসজ্জিত হইবে।

সম্মেলন যেন সম্যক্ মিলন সাধন করায়। সম্মেলন যেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন না হয়। লক্ষ্য করা গিয়াছে, যে সব মণ্ডলীতে নেতৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব লইয়া প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, সেই সকল মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা কেহ কেহ সম্মেলনের স্থানেও নিজ সহরের বা স্বকীয় গ্রামের ঝগড়াটে মেজাজটী লইয়া আসিয়া থাকেন। ইহা অতীব অভদ্রোচিত ব্যাপার এবং নিতান্তই নিন্দনীয়। ইহার দ্বারা কার্য্যহানি হয়।

সম্মেলনে প্রবেশ করিবার কালে সকলে ভক্তি-নম্র চিত্ত লইয়া প্রবেশ করিবেন। দ্বারদেশে চন্দনের বিন্দুটী ললাটে গ্রহণ করিবার সময়ে যখন মস্তকটী নত করিবেন, তখন যেন এই মনোভাবটীর অনুশীলন করেন যে, সমবেত উপাসনা করিতেই যাইতেছেন। ইহা করিলে যাবতীয় আলোচনা প্রেমস্নিগ্ধ এবং প্রেমবর্দ্ধক হইবে।

অমনি তোমরা অনেক সময় নষ্ট কর। প্রতিনিধি-সম্মেলন-কালে সঙ্কল্প করিতে হইবে, "না, সময় নষ্ট করিব না, দশ ঘণ্টার কাজ আমরা এক ঘণ্টায় করিব। কাজই করিব, অকাজ করিব না। এমন ভাবে কাজটুকু করিব, যাহার ফল হইবে





সুদূরপ্রসারী, অক্ষয় এবং অমৃতময়।" স্নিগ্ধ মনটী লইয়া সম্মেলনে প্রবেশ করিবে, স্নিগ্ধতর মনটী লইয়া সম্মেলন হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

সম্মেলন হইতে বাহির হইবার পরে একটী মাত্র মূহূর্ত্ত নষ্ট না করিয়া সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রম আরম্ভ করিবে। ঘরে ফিরিয়াই গ্রামে এবং উপকণ্ঠস্থ সকলস্থানের সকল সমধর্ম্মী, সমমর্ম্মী, সমভাবুক, সমসাধক প্রত্যেকটী নরনারীর কর্ণে সম্মেলনের সমুদ্রমন্থনোত্থ অমৃত বিলাইতে থাকিবে। সম্মেলনে যাহা কিছু লাভ করিয়াছ, তাহাকে ইহাদের প্রত্যেকের সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই সম্পদ্। এই শক্তি এবং সম্পদের অধিকারি-সংখ্যা যত বাড়াইতে পারিবে, ততই তোমার লাভ। বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু,—একথা অনেক মণীষীই বলিয়াছেন। বিস্তার যে সত্যই জীবন এবং জীবন যে সত্যই বিস্তারশীল, এই কথাটুকু তোমাদিগকে প্রমাণিত করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

## (৫)

হরিওঁ

বারাণসী
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৭২

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সদ্বিষয়-চিন্তন এবং সৎকথা-প্রচার যদি লোকমানার্জ্জন-বুদ্ধি হইতে দূরে থাকে, তাহা হইলে জীবনের এক উত্তম অনুশীলন। সদ্বিষয়-চিন্তন মানুষের সহিত সংশ্রব-বর্জ্জিত ভাবেও করা যায়, বরং জন-সংসদ হইতে দূরে থাকিয়াই ইহা সহজতর। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "অরতিজনসংসদি।" কিন্তু সৎকথা প্রচার করিতে গেলে একটী হউক, আর পাঁচটি হউক, মানুষ চাই। শ্রোতা না থাকিলে সৎকথা কাহাকে শুনাইবে? অপরকে সৎকথা শুনাইলে নিজের চিত্তও সদ্ভাবে পূর্ণ হয়। লোকে যাহার মুখে সৎকথা শোনে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে। লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি পাইতে পাইতে মানুষের মনে মানাভিমানের গর্ব্ব আসে, সম্মান পাইবার লোভ জন্মে। এই ত্রুটিটুকু বাদ দিয়া যদি সৎকথা প্রচার করা যায়, তবে তাহার ফল অমৃততুল্য।

বর্ত্তমানের যুবক-সমাজ সৎকথা শুনিতে বড়ই অনাগ্রহী। কেহ শোনায় না বলিয়াই ইহাদের শুনিতে রুচি সৃষ্ট হয় নাই। আবার অসৎ কথা শুনিতে শুনিতে মন কুরুচিতে ভরিয়া গিয়াছে বলিয়াও সৎকথায় ইহাদের রুচি নাই। কিন্তু ইহারাই ত' দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং ইহাদিগকেই ত' অত্যধিক আদর করিয়া সৎকথা শুনাইতে হইবে। ইহাদের সকলকে সৎকথা শুনাইবার ব্রত গ্রহণ কর।

হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপে অস্থির হইয়া যাইবে কিন্তু দমিয়া যাইও না। প্রথমে যাহারা বিরুদ্ধতা করিবে, কিছুকাল পরে তাহারাই





হয়ত তোমার সবচেয়ে বেশী গোঁড়া সমর্থক হইবে। সুতরাং হাল ছাড়িবার কোনো প্রয়োজন নাই। সৎকথা বা সদ্‌গ্রন্থ ইহাদের নিকট কুইনিনের বড়ির মতন লাগিবে, তবু গিলাইতেই হইবে। পরিণামে যে তোমার সৎপ্রচেষ্টার জয় অবশ্যই হইবে, এই বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাও।

যুবকদের মধ্যে যাহারা আমার প্রতি অনুরক্ত আছ, তাহারা সকলে সকল স্থানে সংঘবদ্ধ হইয়া যাও এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলাসহকারে কাজটীতে হাত দাও একাজ জাতিগঠনের গোড়ার কাজ।

চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র অকল্পনীয় সমস্যা দেশের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী নেতারা যে ভাবে নিজ নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আর অতীতের সাধারণ সমস্যাবলী যে-ভাবে বর্ত্তমানে জটিল, কুটিল ও গ্রন্থিল হইয়া সমাধানের অতীত হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে জাতির মনে এই একটা কাপুরুষোচিত আবেদন জাগিয়াছে যে, যত মহাপুরুষেরা আসিয়া তাহাদের সমস্যাসমূহ মিটাইয়া দিন। মহাপুরুষদের ইহা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা সর্ব্বসাধারণেরও কর্ত্তব্য। একজন মহাপুরুষে এবং একজন সাধারণ মানুষে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, সাধারণ মানুষ যেখানে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া সকলের হিতের জন্য স্বল্পমাত্র প্রয়াস পাইয়া থাকে, সেখানে মহাপুরুষ হয়ত সমস্ত জীবনের সর্ব্বশক্তিকে উৎসর্গ করিয়া দেন।

কিন্তু শত সহস্র লক্ষ জন অনুপূরক কর্ম্মী যখন মহাপুরুষের আরব্ধ কর্ম্মের আংশিক হইলেও অনুকরণ করেন, সমস্ত জাতি-শরীরে জাগরণের সঞ্চারণ হয় তখন। সমস্ত জাতির অভ্যুদয় যেখানে লক্ষ্য, সেখানে একজন নেতা বা একজন গুরু বা একজন রণদুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি আসিয়া সবকিছু করিয়া দিবেন, ইহা মনে করা ভুল।

কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে অধিকাংশ লোক সেইরূপই ভাবিতেছে। নামী নামী মহাপুরুষেরা সকলকে অলসের মতন বসিয়া থাকিতে বলিয়া কেবল একক প্রযত্নে ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা দেশোদ্ধার করিবেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। মহতেরা মহৎ হইয়াছেনই এইজন্য যে, অপরেরা তাঁহাদের অনুপম জনসেবার আংশিক হইলেও অনুবর্ত্তন করিবে এবং সকলের সম্মিলিত কর্ম্মের শুভফল জাতির ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। অর্থাৎ মহতের করিবার অনেক কিছু আছে কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিদেরও কিছু কিছু করিবার অধিকার আছে, প্রয়োজনও আছে।

সেই অধিকারের দাবিতে এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদে তোমরা প্রত্যেকে বর্ত্তমান যুবক-সমাজের অশুচি মনগুলিকে শুচি করিবার কাজে লাগিয়া যাও। সৎকাজে সহস্র বাধা ইহা যেমন সত্য, সৎকাজে ঈশ্বর সহায় ইহাও তেমন সত্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ





(৬)

হরিওঁ বারাণসী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,— প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি এমন একটা স্থানে বদলী হইয়াছ, যেখানকার লোকের ভাষা আলাদা। ধর্ম্ম যে আলাদা নহে, ইহা তোমার সৌভাগ্য। যদিও তাত্ত্বিক বিচারের দিক দিয়া স্থানীয় জনগনের ধর্ম্মীয় দার্শনিকতা তোমার আলাদা তথাপি ইহাদের ধর্ম্মাচরণকে তোমারই পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারো কাহারো ধর্ম্মাচরণের সহিত প্রায় অভিন্ন বলিয়া মানিয়া লইতে তোমার মনে দ্বিধা নাই। এই কারণে ইহাদের ভাষা তোমার নিকটে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইলেও ইহাদের সহিত বিনা চেষ্টায় একপ্রকার আন্তরিক ঐক্য তুমি উপলব্ধি করিতেছ, যাহা তোমাকে সাম্প্রদায়িক উৎপাতের ভয় হইতে নিশ্চিন্ত রাখিয়াছে। এখন তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে সযত্নে জনপদবাসীদের ভাষা শিক্ষা করা। ইহাদের ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে হইলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা লাভের জন্য ব্যস্ত হইও না। ইহাদের ভাষায় ইহাদের সঙ্গে কথা বলিয়া সকল কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে চালাইবার যোগ্যতা তোমাকে অর্জ্জন করিতেই হইবে। অন্ধ্রে থাকিব, তেলেগু শিখিব না, পাঞ্জাবে থাকিব, গুরুমুখী শিখিব না, উড়িশায় থাকিব, ওড়িয়া শিখিব না, আসামে থাকিব, অসমীয়া শিখিব না, ইহা অন্যায়

জিদ্‌। একজনের মাতৃভাষায় তাহার সহিত কথা বলিতে ব্যাকরণের ভুল করিলেও সে খুশী হয়। তোমার কাজ মানুষকে লইয়া। যাহাকে যে ভাষায় কথা বলিলে মনের ভাব প্রকাশ সহজতর, সে ভাষায়ই কথা বলা উচিত। অপরের মাতৃভাষায় তাহার সহিত কথা বলিলে সে যদি খুশী হয়, তবে তাহার চেষ্টা করা সঙ্গত।

বর্ত্তমানে ভাষা লইয়া ভারতে বড় অশোভন চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে। একের ঘাড়ের উপর অপরের ভাষা জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টাটাই মারমুখী মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অপপ্রয়াস যখন মাননীয় গণনেতাদের প্ররোচনা বা প্রশ্রয় পায়, তখন ইহা সংহতির সীমা লঙ্ঘন করে। সমাজে বা ইতিহাসে অস্বাভাবিক ব্যাপারের স্থান নাই। অপক্রিয়ার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয় এবং ভারসাম্যের নাম করিয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে মর্ম্মান্তিক ভাবে আহত এবং প্রহত করিয়া সমাজ বা ইতিহাস নূতন দিকে গতি লয়। স্বাভাবিক ভাবে প্রায় সকল ভাষার মধ্যে নৈকট্য স্থাপন যাহা করিলে হইতে পারিত, ভারতের সংস্কৃতির মূলগত ধারার সহিত অপরিচিত থাকার দরুণ রাজনৈতিক নেতারা সেই স্বাভাবিক পথকে অবহেলা করিয়াছেন। ফলে, নানা অবাঞ্ছনীয় ঔদ্ধত্য এবং বিরোধ-পরায়ণতা ভারতের প্রেম-শূন্য মাঠে তরবারির আস্ফালন করিয়া যাইতেছে। তোমরা এই সকল ক্ষণধ্বংসী রাজনৈতিক





উচ্চাভিলাষীদের বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ঘরে বসিয়া সংস্কৃত পড়। প্রবাসে যাইয়া সে-দেশবাসীদের ভাষা শিখ এবং যখন যে অঞ্চলে যে ভাষার সহায়তায় উচ্চ ও উন্নততর আদর্শমূলক চিন্তাসমূহ প্রচার করা সুবিধাজনক হইবে, তখন সেই ভাষার সহায়তা গ্রহণ কর। ভাষা ত' অপর মানুষের মনের কাছে পৌছিবার জন্য। সুতরাং পৃথিবীর কোনও ভাষাই তোমাদের পক্ষে বর্জ্জনীয় নহে।

নূতন জায়গায় গিয়াছ, নূতন ক্ষেত্র গড়। স্থানীয় অধিবাসীরা বাদে ওখানে পাঞ্জাবী ও রাজস্থানীরাই প্রধান,—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। একদা বাঙালী যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া নানা দূরদেশে ছুটিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে পাঞ্জাবীরা সেই উদ্দীপনার মূর্ত্ত বিগ্রহ। বিশেষ কথা এই যে, তাহারা দিস্তার পর দিস্তা খাতা লেখার অভ্যাসে অনাদর করিয়া বাহু-সঞ্চালন করিয়া পরিশ্রম করিতেই আগ্রহী। রাজস্থানীরা বাণিজ্য করিবার আগ্রহে পথের দুর্গমতা এবং স্থানের দূরত্ব কদাচ গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু ঐ দুর্গম স্থানে বাঙ্গালীও যে কিছু গিয়াছে, ইহা আশ্বাসের কথা। ইহাদের সকলের সহিত আস্তে আস্তে পরিচয়-স্থাপন কর। ইহাদের প্রত্যেকের মনে এই উদ্দীপনা দাও যেন, কোঁচা দুলাইয়া কেরাণীবাবুর শূন্য উদরে শুষ্ক হাসির লীলাভিনয় না করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যে মন দেয়। কৃষি বা পশুপালনে প্রচুর অর্থ হয় না কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া নিজের অন্ন খাওয়া যায়। বাণিজ্যেই লক্ষ্মী কিন্তু ইহাতেও হঠাৎ বড়লোক হওয়া যায় না, দীর্ঘকাল লাগিয়া থাকিতে হয়।

বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, নেপালী, মণিপুরী, নাগা প্রভৃতি যে জাতির যে-লোকই পাও, এই একটী প্রত্যয় প্রত্যেকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষ এক। এই একত্বই আমাদের স্বাভাবিক সম্পদ। দল, মত, সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এক মানুষ অপর মানুষের অনাত্মীয় হইতে পারে না। সকল মানবে একত্ববোধ জাগাইয়া তোলে যে সুমহতী প্রচেষ্টা, তাহারই নাম ধর্ম্ম-সাধনা।

কথাটুকু অনেকের কানে নূতন লাগিবে। কিন্তু নূতন হইলেই কোন কথা মিথ্যা হইয়া যায় না। কথাটুকু কাহারো কাহারো নিকটে অতি পুরাতন বলিয়া ঠেকিবে কিন্তু পুরাতন হইলেই সত্য বস্তুর মহিমাহ্রাস ঘটে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৭)

হরিওঁ বারাণসী

২০শে শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমরা আমাদের সমবেত উপাসনার তারিখগুলি প্রতিবৎসরই এমন ভাবে ফেলিয়া থাকি, যাহা সাধারণত হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ এবং শিখদের কোনও না কোনও পুণ্যদিনে





পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে-সম্প্রদায় যে-ভাবেই ভগবানকে ডাকুন না কেন, তাঁহাদের ভগবানকে ডাকিবার বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবীজোড়া সকলের ঈশ্বরানুগত ধর্ম্মভাবের প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহি। ইহা আমাদের সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমদর্শিতা মাত্র।

মুসলমানদের ইদুজ্জোহা বা ফাতেহাদোয়াজদাহমের দিন এইজন্যই গাইঘাটাতে তুমি উপাসনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলে। সে উপাসনায় প্রণব-বিগ্রহই তোমাদের পূজাবেদীতে ছিলেন এবং কোন হিন্দুর পক্ষে যাহা অননুমোদনীয় নহে, তাহাই সব ছিল। প্রয়োজন বিশ্বদেবতাকে ডাকা, আয়োজন সর্ব্বজনের অবিরোধী। তবু একদল হিন্দু ভদ্রলোক তোমাদের এই সমবেত উপাসনায় বাধা দিয়াছিলেন, উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তখনি আমি বলিয়াছিলাম, এই সব ভদ্রলোক ভ্রান্ত বুদ্ধির প্ররোচনায় ইহা করিতেছেন। একদিন নিজেদের ভুল বুঝিবেন এবং তোমাদের সমবেত উপাসনায় সাগ্রহে সসম্ভ্রমে যোগদান করিবেন।

একদিন হয়ত কোনও মুসলমান ভদ্রলোক বলিয়া বসিতে পারেন,—"আমাদের ইদুজ্জোহার দিন, আমাদের ফাতেহা-দোয়াজদাহমের দিন তোমরা কেন তোমাদের সমবেত উপাসনা করিবে?" একদিন কোনও খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ ভদ্রলোক বলিয়া বসিতে পারেন,—"আমাদের খ্রীষ্টমাস দিনে বা বুদ্ধ-পূর্ণিমার তিথিতে আমরা আমাদের প্রথাগত উপাসনা করিয়া যাইতেছি,

তোমরা কেন সেই দিন আবার তোমাদের সমবেত উপাসনার জন্য তারিখ ফেলিলে?" ইহার জবাবে বলিব,—"সকল-ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজ নিজ মতে ও পথে নিজ নিজ রীতিতে ও প্রণালীতে, নিজ নিজ প্রথায় ও পদ্ধতিতে সেই পরমপ্রভুরই আরাধনা করিয়া থাকেন, যাঁহাকে আমি আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। পৃথিবীর সকল-মতাবলম্বী ঈশ্বরোপাসকেরাই আমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মীয়,—এই জন্যই তাঁহারা যেই দিন বিশেষ উৎসব সহকারে ভগবানকে ডাকিতেছেন, সেইদিন আমার ভিতরেও উৎসব-শিহরণ জাগিয়া ওঠে। আমার ইচ্ছা করে, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মহানন্দে ঈশ্বরের গুণ-গান করি। কিন্তু এক এক সম্প্রদায়ের উৎসবের ছন্দ এক এক রকম। সকলের সকল স্থানে শারীরিক উপস্থিতি শোভনীয়ও নহে। কিন্তু প্রতিজনের প্রতি উৎসবে মানসিক উপস্থিতি আমার নিবারণ করিবে কে? অন্তরের অন্তরে সকলের প্রাণভরা ভগবন্নামোচ্চারণের সঙ্গে আমি সাথী হইতে চাহি। কেহ মুসলমান বা খ্রীষ্টান বলিয়া তাঁহার অন্তরের এই প্রেমব্যাকুল অবস্থার সময়ে তাঁহার কাছ হইতে আমি দূরে থাকিব না, থাকিতে পারিব না। এইজন্যই আমাদের সমবেত উপাসনার তিথিগুলি কোনও নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বিচারে নির্দ্ধারিত হয় না।"

উল্লিখিত উক্তির ভিতরে যে অকপট সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহা যাঁহারা বুঝিবেন, তাঁহাদের তর্ক বা বিরোধ করিবার কোনও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সকল মানুষ একমতাবলম্বী





হইবে, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষে উপাসনার একটী সাধারণ মঞ্চ থাকিবে, ইহাও অসম্ভব নহে। শেষোক্ত লক্ষ্য লইয়া আমি সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছি, কাহারো ধর্ম্মহানি করিবার জন্য নহে।

সহানুভূতি-পরায়ণ আলোচনার স্নিগ্ধ আলোকে কথাটী সুস্ফুট হইয়া উঠিলে একদা সমবেত উপাসনার সম্মুখস্থ বাধা-বিঘ্নের প্রাচীর নিশ্চিতই ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে।

কিন্তু উপাসনাই করি আর তত্ত্বালোচনাই করি, আমরা যদি দেশের যুবকগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদের অনেক আন্দোলনই দেখিতে না দেখিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। কি দুর্দ্দান্ত পরাক্রম লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তোমরা জান না। যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজের নবজাগরণের ইতিহাস লিখিতে গিয়া হিন্দুমহাপুরুষদের জীবন-চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে সত্য ইতিহাসকে সেইভাবে কুজ্ঝটিকায় অবলেপন করিয়া দিয়াছেন, যেমন করিয়া বর্ত্তমানের কংগ্রেসী নেতারা বাঙ্গালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ বিক্রম লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ত্যাগ, বৈরাগ্য, দুঃখসহন, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ, সত্যকথনে নির্ভীকতা এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য অন্তরের ব্যাকুল সহানুভূতি যদি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম যুগের অধিকাংশ

ব্রাহ্ম প্রচারক মনুষ্যকূলের অলঙ্কার ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যকে যৌবনের একটা অনবহেল্য নিষ্ঠারূপে গ্রহণ করাইবার দিকে এই সমাজটার ঝোঁক ছিল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এইদিকে নেতৃস্থানীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে ডিমোক্রেসীর জয় হইল, ব্রহ্মচর্য্যানুকূল মহতী নিষ্ঠা কলিকা পাইল না। ব্রাহ্ম-সমাজের দুর্দ্দমনীয় তেজ আস্তে আস্তে মধ্যাহ্ন-গগন ছাড়িয়া দিয়া গোধুলির মেঘমালায় মিলাইয়া গেল। ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য।

সেই ভুল তোমরা আবার করিও না। এযুগে ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিলে মনস্তত্ত্বজ্ঞেরা উপহাসের হাসি হাসেন। চিত্রাভি-নেতারা সিগারেটের ধোঁয়ায় দুঃসাহসী কথককে শূন্যে উড়াইয়া দেন। ঔপন্যাসিকেরা সিক্নী ঝাড়িতে ঝাড়িতে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একটুখানি তাকান। সাধারণ মানুষ সন্দিগ্ধ চিত্তে এদিক ওদিক তাকাইয়া লম্বা পা ফেলিয়া রাস্তা পার হইয়া যান। "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দটি যে উচ্চারণ করিয়াছে, সে হঠাৎ চাহিয়া দেখে, এতবড় দারুণ ভীড়ের মাঝখান হইতে সব মানুষ সরিয়া গিয়াছে, পড়িয়া রহিয়াছে একটা শূন্য মাঠ।

তথাপি তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের কথাই কহিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**





**(৮)**

হরিওঁ বারাণসী
২০শে শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হিমালয়ের পাদপ্রান্তে ক্ষুদ্র একটী চা-বাগান। চতুর্দ্দিকে পার্ব্বত্য নদীর উৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ড আর মাঝখানে চা গাছের সুচিক্কণ হরিৎ শোভা। প্রত্যাশা করি নাই সেখানে গিয়া দেখিব যে, তোমার মতন সামান্য একটী কেরাণী এতগুলি ভিন্ন-ভাষাভাষী অশিক্ষিত নরনারীর প্রাণে এমন করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবে। স্বল্প সময় ছিলাম কিন্তু তাহার শাশ্বত স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া ফিরিয়াছি।

আর তুমি বলিতেছ যে, তোমার অযোগ্যতায় সেখানে কিছুই কাজ হয় নাই। তোমার এই বিনয়টুকু ভাল, কেন না ইহা তোমাকে আরও কাজ করিতে উদ্দীপনা দিবে। বিনয়-বর্জ্জিত অহং-প্রমত্তেরা কিছু না করিয়াই ভাবিয়া থাকে, খুব করিয়াছি, আর কত। তোমার মত বিনয় আমার সকল সন্তানের হউক।

অশিক্ষিত জনসমাজে আদিম কুসংস্কারগুলির এমন প্রভুত্ব যে, তাহাদিগের ভিতর সত্যিকারের কোনও কাজ করিতে হইলে একদিকে যেমন প্রয়োজন ধারাবাহিক চেষ্টায় তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধন, অপরদিকে তেমন প্রয়োজন তাহাদিগকে মাঝে মাঝে হুজুগ দিয়া চেতাইয়া তোলা। কোথাও

দেখিয়াছি উৎসবের হুজুগ, কোথাও দেখিয়াছি যুদ্ধ-জয়ের হুজুগ, কোথাও দেখিয়াছি উদ্দণ্ড নাম-কীর্ত্তনের হুজুগ, কোথাও দেখিয়াছি মৃগয়ার হুজুগ, কোথাও স্বাধীনতা অর্জ্জনের হুজুগ, কোথাও পররাজ্য-গ্রাস বা পরদ্রব্য-লুণ্ঠনের হুজুগ সৃষ্টি করিয়া অশিক্ষিত জনসমাজের উন্নতি সাধনাভিলাষে তাহাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে রূপান্তরিত হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, হুজুগের উপযোগিতা আছে। সুতরাং হুজুগকে কেবল নিন্দাই করিতে পারি না। বাঙ্গালী যদি ১৯০৫-এ বিদেশী বর্জ্জনের হুজুগ সৃষ্টি না করিত, তাহা হইলে নেতাজী সুভাষ ১৯৪১-এ "দিল্লী চলো"র প্লাবন সৃষ্টি করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এক একটা হুজুগ এক একটা প্লাবনের সৃষ্টি করে এবং পরবর্ত্তী কৃষির জন্য পলিমাটি রাখিয়া যায়। কিন্তু কেবল হুজুগ লইয়াই যদি থাকিতে হয়, তাহা হইলে মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। রণনেতা, জননেতা, কর্ম্মনেতা, ধর্ম্মনেতা সকলকেই এক এক সময়ে হুজুগ সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যিনি সময়োচিত ভাবে ইহা করিতে পারিয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তী কালে অতুলনীয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

অশিক্ষিতগণের মধ্যেই কেবল হুজুগ প্রয়োজন, তাহা নহে। যুক্তিনিষ্ঠ, পরিমার্জ্জিত, শিক্ষিত মনকেও উপযুক্ত ভাবে সৃষ্ট হুজুগ কর্ম্মতৎপর করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু কর্ম্মচাঞ্চল্য যখন নিদারুণ গতিতে উত্থান-পতনের আবর্ত্ত সৃষ্টি





করিয়া ঝঞ্ঝার মত অবলীলাক্রমে চলিতে থাকে, তখন কর্ম্মই এমন একটা হুজুগ হইয়া যায়, যাহার লোক-বিস্ময়কর আকর্ষণে সকলকে টানিয়া আনে। ভারতের বুদ্ধিমান নেতারাও যখন ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া "আজাদ-হিন্দ" বাহিনীর গঠনকারী সুভাষচন্দ্রকে দেশদ্রোহী বলিয়া গালি দিতেছিলেন, তখন যদি পূর্ব্বভারতের লোকেরা কেবল জানিতে পারিত যে, সুভাষচন্দ্র কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, তাহা হইলে নিমেষের মধ্যে এমন হুজুগ সৃষ্টি হইয়া যাইত, যাহাতে সুভাষচন্দ্র মণিপুর প্রবেশের পূর্ব্বেই লক্ষ লক্ষ নরনারীর আত্মবিসর্জ্জনের ফলে ভারত বাহুবলে স্বাধীন হইয়া যাইত। সুভাষচন্দ্র তাহা জানিতেন। তাহারই জন্য তিনি তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারতবাসীকে বারংবার শুনাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই বধির জাতি তাহা শোনে নাই।

শুধু হট্টগোলই যেখানে হইল ক্লান্তি আর অপব্যয়ের বোঝা ছাড়া আর কিছু যেখানে কথা কহিবার জন্য রহিল না, সেখানে হুজুগ দুর্য্যোগ সৃষ্টি করে, সেখানে হুজুগ সুযোগ নহে। হুজুগকে বাদ দিতে পার না কিন্তু হুজুগকে সর্ব্বস্ব-ধনও বলিতে পার না।

তুমি যেই সকল অশিক্ষিত নরনারীর ভিতর কাজ করিতেছ, তাহাদের অন্তরলোকের মহিমান্বিত বিশালত্বের সম্ভাবনার দিকে সশ্রদ্ধ বিশ্বাসপরায়নতা রাখিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হও। সহস্র চিরপোষিত কুসংস্কারের সহিত আর একটা কুসংস্কার

তাহাদিগের জন্য উপঢৌকন দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য নহে, তোমার আদর্শবাদের সংস্রবে আসিয়া একটা একটা করিয়া ইহাদের পূর্ব্ব কুসংস্কার শুষ্ক ঘায়ের চুমড়ির মতন আপনা আপনি খসিয়া পড়ুক, ইহাই তোমার বাঞ্ছনীয় হউক।

সহকর্ম্মী পাইতেছ না, ইহা খুবই দুঃখের কথা। সহকর্ম্মী যে পাইবে না, ইহা আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, শিক্ষিত মানুষগুলিরও লাবড়া-খিচুড়ীতে যে পরিমাণ আসক্তি, প্রকৃত কোন স্থায়ী কর্ম্মে তাহার এক-শতাংশ রুচি নাই। আমাদের পূর্ব্বজ ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে সকল ধর্ম্মীয় হুজুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার আকর্ষণেই প্রত্যেকটা মানুষ চরকীবাজীর মতন হুজুগ হইতে হুজুগান্তরে কেবল ঘুরিয়া মরিতেছে। কর্ম্মে রতি বা স্থিতি কি করিয়া হইবে? আগে একটা শোভাযাত্রা না হইলে মহান বাগ্মীর সভাস্থলেও শ্রোতা মিলে না, ইহা কি হুজুগেরই জয়-জয়কার নহে? খুব কতক্ষণ শঙ্খ, ঘন্টা, করতাল বাজাইয়া ধুপ দীপ জ্বালাইয়া, চামর দোলাইয়া আরতি না করিলে, উপাসনার আসর জমে না, ইহা কি হুজুগেরই মহিমান্বিত প্রতাপ নহে? কিন্তু অকারণ হুজুগ আমাদিগকে বর্জ্জন করিতেই হইবে। আমি ত' সমস্ত জীবন শুধু অশিক্ষিতদের মধ্যেই কাজ করিয়া যাইতেছি। জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, প্রফেসার শিষ্য আমার কয়জন? আঙ্গুলে ইহাদের গণা যায়। কিন্তু এই তুচ্ছ লোকটার মুখ





হইতে ইষ্টমন্ত্রের উচ্চারণটুকু উভয় কর্ণে শুনিয়া যাইবার জন্য যে সকল নরনারী দুর্গম পথ-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া এক এক স্থানে শতে, সহস্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহাদের কিছু অর্দ্ধ-শিক্ষিত, অধিকাংশ অশিক্ষিত। ইহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত শত শত কুসংস্কার আছে। মুখের উপদেশ দিয়া কতজনের কুসংস্কার দূর করিব? যুক্তি কত দেখাইব? তর্ক কত করিব? একটী প্রশ্নের মীমাংসা হইতে না হইতে তিনটী সমস্যা আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। সংশয়কে রক্তবীজের রক্ত জানিবে, একবিন্দু কোথাও পড়িলে সেখান হইতে আবার আর একটা রক্তবীজ গজাইবে। তাই বেশী উপদেশ, বেশী যুক্তি-তর্ক, বেশী কথা আর বেশী ব্যাখ্যার মধ্যে না যাইয়া বলিয়া দিয়াছি,—"যাহা পাইলে, তাহার সাধন কর," সাধন করিতে করিতে সকল উত্তর মিলিবে, সাধন করিতে করিতে সকল কুসংস্কার কাটিবে। প্রত্যহ প্রতিদিন কত জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সব দেখিতেছি।

সুতরাং তুমিও হতাশ হইও না। সকলকে কেবল বল, ভাই সাধন কর। হাতে ধরিয়া বল, সাধন কর; পায়ে পড়িয়া বল, সাধন কর; সাশ্রুনয়নে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বল, সাধন কর। যেদিন সাধন সুরু হইল, জানিবে কুসংস্কারের মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৯)

হরিওঁ বারাণসী

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি যে সৎকথা শুনিলে, ইহা তোমার লাভ, বক্তার প্রতি ইহা তোমার অনুগ্রহ নহে। তুমি দয়া করিয়া সৎকথা শোনাতে বক্তার আত্মপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোনও লাভ নাই। হাঁ, আর একটা লাভ আছে বটে, তাহা হইতেছে, সৎকথার চর্চ্চাজনিত চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু তুমি যদি তাঁহার কথা শুনিতে নাও যাইতে, তবু তিনি তাঁহার কথা তোমার চেয়ে কম গণ্যমান্য সাধারণ লোকদের কাছে বলিতেন। শ্রবণের ভাগ্য যাহার ঘটিত, সে-ই লাভবান্ হইত। সৎকথা আজ যাহা শুনিলে, তাহা সদ্যঃ সদ্যঃ তোমার কাজে নাও লাগিতে পারে। হঠাৎ এমন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে কাজে লাগিয়া যাইবে, যখন কৃতজ্ঞতায় তুমি সৎকথার কথককে শতবার ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হইবে।

সৎকথা শুনিতে বিনীত মন লইয়া যাইবে, দাম্ভিকের উদ্ধত শির লইয়া নহে। প্রকৃত সৎকথকেরা তোমার সেবাপূজা চাহেন না। ইহা দিয়া তাঁহাদের কোনও প্রয়োজনও নাই। কিন্তু তোমার মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে সৎকথার প্রভাব তোমার উপরে সহজে পড়িবে না, পড়িলেও তাহা ক্ষীণ ভাবে পড়িবে, গভীর ভাবে পড়িবে না, নিতান্ত তরল প্রভাব সে তোমার





উপরে বিস্তার করিবে। মানুষকে যাঁহারা সৎকথা শোনান, সকলেই তাঁহারা পরস্বাপহারক প্রবঞ্চক, এইরূপ বদ্ধমূল কোনও ধারণা মনে রাখিতে নাই। তোমার সঙ্গে ত' তাঁর সম্পর্ক মাত্র বলার আর শোনার। তিনি কি তোমার কাছে অর্থ চাহেন না সম্পত্তি চাহেন? প্রকৃত সৎকথকদের অধিকাংশই ত' পরধনে লোভহীন। হাঁ, যদি দেখ যে, সৎকথার অন্তরালে অপরের স্বার্থহানির কোনও চেষ্টা রহিয়াছে, তাহা হইলে এমন সৎকথককে বর্জ্জন করিও।

সদা-সন্দিগ্ধ ভাব লইয়া মানুষের জীবনে সুখ হয় না। বেপরোয়া বিশ্বাস দিয়াও মানুষ অনেক সময়ে অকারণে ঠকে। সুতরাং অপরিচিত অজ্ঞাতচরিত্র ব্যক্তির সম্পর্কে অতি-বিশ্বাসও করিবে না আবার নিরন্তর খুঁতখুঁতে স্বভাব লইয়া তাহার দোষ আবিষ্কারেও লাগিয়া রহিবে না! সাধারণ জীবন-যাত্রার পথে যাকে যতটুকু বিশ্বাস সমুচিত, ততটুকুই করিবে এবং নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কোনও বিপত্তিতে আবার গিয়া না পড়, তার জন্য সতর্কতাও রাখিতে হইবে। সঙ্গত বিশ্বাস ভদ্রতার অঙ্গ, সঙ্গত সতর্কতা আত্মরক্ষার অঙ্গ। আমি ভদ্রতা করিব বলিয়া আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকিব, আত্মরক্ষা করিতে হইবে বলিয়া অভদ্রোচিত সন্দিগ্ধচিত্ত হইব, ইহা কখনো হইতে পারে না। জগতে একমাত্র ঈশ্বর-প্রেম ব্যতীত আর সকল ব্যাপারেই মাত্রাজ্ঞান অব্যাহত রাখিয়া চলিতে হইবে। ভগবানকে ভালবসিবার ব্যাপারে কোনও সীমান্তচিহ্ন আঁকিবার প্রয়োজন নাই।

বলিতে পার, ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সমস্ত সময় কাবার করিয়া দিলে সংসারের কর্ত্তব্যগুলি করিবে কি প্রকারে? কিন্তু আমি সংসারের কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিতে বলিতেছি না। বলিতেছি যে, পত্নীপ্রেম, পুত্রপ্রেম, কন্যাপ্রেম, বন্ধুপ্রেম, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বন্ধু-বাৎসল্য এবং স্বজনে সৌহৃদ্যের একটা মাত্রা আছে, ভগবৎপ্রেমের কোনও মাত্রা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, চূড়ান্ত নাই। ভগবানকে যতই ভালবাসিবে, ততই অধিকতর ভালবাসিতে হইবে। ভালবাসিতে বাসিতে ভালবাসা যদি শেষ হইয়া গেল, তবে বুঝিতে হইবে, এ ভালবাসা তোমার ভগবানের প্রতি ছিল না, অন্য কোনও স্থানে অর্পিত ভালবাসা ভগবৎপ্রেমের নাম ধরিয়া তোমাকে এতদিন ছলনা করিতেছিল। ভগবৎ-প্রেম কাহাকেও কর্ত্তব্য-বিমুখ করে না। ভগবৎপ্রেম জীবনের সবগুলি কর্ত্তব্যকে একটী পরমকর্ত্তব্যের অধীনে আনিয়া প্রত্যেকটীকে যথাযথ পালন করিবার রুচি, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, আগ্রহ, ব্যগ্রতা ও সামর্থ্য দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (১০)

হরি-ওঁ

বারাণসী

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।





ছোট্ট একটী ঘর। একটী তরুণ স্বামী এবং তাহার তরুণী পত্নী ইহাতে বাস করে। ছোট্ট একটী দুইটী শিশু। মাঝে মাঝে ইহাদের ঘরের নিঃশব্দ শান্তিকে স্নিগ্ধ গুঞ্জরণে খণ্ডিত করে। স্বামীর চাকুরীটী সামান্য। স্ত্রীর লেখাপড়া অল্প।

তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা দুনিয়ার দুই অপদার্থ, তোমাদের দ্বারা জগতের কোনও কাজ হইবে না, মিছিমিছি এই ধরণীতে আসিয়াছ আর কেবল যে-কোনও প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই তোমরা মহাশূন্যের পানে পা বাড়াইবে।

ঐ শিশু দুইটীকেই কেন্দ্র কর। উহাদের মধ্যে নিখিল-বিশ্বের পরম কুশলের বীজ সম্পুটিত রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস কর, ইহাদের মুখের আধ-আধ বুলিকে সুস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য নিজেরা নিজেদের উচ্চারণকে সংশোধিত কর। ইহাদের মন ও মস্তিষ্ককে অদূর ভাবীকালে জগতের বৃহত্তম সমস্যাগুলির সমাধানকে লক্ষ্য করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিবার দিকে দৃষ্টি দাও। ইহাদের লইয়াই কোটি কোটি সৌরজগৎ তোমার কুটীরের স্বল্প-পরিসর স্থানটুকুর মধ্যে আসিয়া জড় হইয়া যাউক। নূতন করিয়া তোমরা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই দুইটী শিশুর ভিতরে বিধাতার অপূর্ব্বতার সৃষ্টি সচ্চিন্তাকে সৃজীয়মান করিয়া তোল।

ইহাই তোমাদের সংসার। অন্নার্জ্জনের পরিশ্রম সংসার নহে। রক্তমাংসের আবেগ সংসার নহে। ক্ষুৎ পিপাসার আক্রমণ সংসার নহে। অর্থের অর্জ্জন আর অর্থের ব্যয় তোমাদের সংসার

নহে; ইহা তোমাদের প্রকৃত সংসারের কখনও আবশ্যকীয় যোগবাহ, কখনও বা অবান্তর উপসর্গ। তোমাদের সংসার ঐ শিশুকে লইয়া, উহার ভাবীজীবন লইয়া, উহার পরিবর্দ্ধন, বিকাশ এবং ব্যঞ্জনা লইয়া, উহার স্বভাব, স্বোপার্জ্জিত ভাব এবং ভবিষ্যদ্ বংশীয়গণের মধ্যে সংক্রমণযোগ্য সংস্কারগুলি লইয়াই তোমার সংসার। এই সংসারের গুরুত্ব, গভীরত্ব এবং ব্যাপকত্ব, এই সংসারের সুদূর-বিসর্পিতা এবং আদর্শ সম্প্রসারণের উপযোগিতা তোমাদের চিন্তা ও চেষ্টার উপজীব্য হউক। এই শিশুদের প্রতি অফুরন্ত প্রেম লইয়া, মোহ লইয়া নহে, মায়া লইয়া নহে, অপার্থিব এবং নিষ্কাম স্নেহ লইয়া ইহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিতে থাক।

প্রত্যেকটী জনক-জননী যখন ইহা করিবে, তখন জানিবে, জাতির মুক্তি অদূরে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

**(১১)**

হরিওঁ

বারাণসী
১লা ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।





চিন্তা কর তোমাদের অতীত জীবন, যাহা ছিল কর্ম্মের আধার, যাহা ছিল ভয়হীন দুর্দ্দান্ত কর্ম্ম-সাধনার, যাহা জীবন ও মরণকে সমান জ্ঞান করিয়া নিয়ত ছিল কর্ত্তব্যে মুখর। আজ সমগ্র সমাজের চেহারা বদল হইয়া গিয়াছে। মহৎ জীবন যাপনের কথা ছাড়িয়াই দাও, সৎ জীবন যাপনই আজ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি হতাশ হইলে চলিবে না। যে আদর্শ চিরন্তন, যে আদর্শ শাশ্বত সত্যের ধারক ও বাহক, তাহাকে সমাজ-জীবনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

"অসম্ভব" বলিয়া পিছন ফিরিলে চলিবে না। "অনাধুনিক" বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করিলে চলিবে না। আধুনিকতার মোহে আমরা অনেক মহিমান্বিত সম্পদ হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি, অনেক শান্তি, অনেক তৃপ্তি, অনেক আশ্বস্ততা হারাইয়াছি। সেকেলে বলিয়া লোকে নিন্দা করিবে বলিয়াই আমরা আমাদের উপলব্ধ সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। আমরা ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের ভিত্তিমূলে স্থাপন করিব।

আর করিব আমরা স্বাবলম্বনের আরাধনা। পরমুখাপেক্ষা নহে, স্বাবলম্বনই আমাদের উপজীব্য হউক। আত্মবলে আমরা ত্রিভুবন-জয় করিব, পরের অনুগ্রহের পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া তাকাইয়া আমরা একটী জীবনও নষ্ট হইতে দিব না।

ইহার জন্য চাই পরমেশ্বরে অফুরন্ত বিশ্বাস আর পরমেশ্বর-দত্ত আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তির অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ আস্থা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

**(১২)**

হরিওঁ বারাণসী
৫ই ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া খুবই সুখী হইলাম।

বিশ্বসংসারের সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইতেছে, ইহা যুক্তি দ্বারা বোঝা যায়। কিন্তু যতদিন ঈশ্বর-দর্শন না হইতেছে, ততদিন ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্তর্গত বলিয়া অনুভব করা যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আছে। কিন্তু ঈশ্বর-দর্শনের ফলে নিজেকে সম্যক্‌রূপে ঈশ্বরের দাস বলিয়া জানিলে অথবা নিজেকে তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া জানিলে তখন নিজের বলিয়া কোন কর্ম্ম থাকে না এবং নিজের জন্য কোন কর্ম্মফলও থাকে না। তখন সকল কর্ম্ম ভগবানেরই কর্ম্ম, সকল কর্ম্মফল ভগবানেরই কর্ম্মফল; জীবের আর কোন দায়িত্বই নাই। ইতি

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**





**(১৩)**

হরিওঁ বারাণসী
৫ই ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংঘের অক্ষুন্নত্ব রক্ষা করিতে হইলে সকলের একলক্ষ্য হইতে হয়।

বিত্তবান্ বা দরিদ্র বলিয়া কোন কথা নাই। যার যার হিসাবে সে ত্যাগ-স্বীকার করিবে, ইহা আবশ্যক। তোমরা প্রত্যেকে আদর্শ মানব হও। ঈশ্বরে বিশ্বাস আসিলে মানুষ সর্ব্বকার্য্য করিতে পারে। তোমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হও। ঈশ্বর-বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্যই তোমাদের সাধন করিবার প্রয়োজন। কাজও কর, সাধনও কর। পরমেশ্বরের নাম কদাচ তোমরা ভুলিও না। আমার প্রত্যেকটী সন্তানকে তোমরা ডাকিয়া বল, তাহাদিগকে মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। তাহাদিগকে জগতে অসংখ্য সদ্দৃষ্টান্ত রাখিতে হইবে। পাপতাপ ভরা নরক-সদৃশ এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে স্বর্গের নন্দন সৃষ্টি করিতে হইবে।

তোমাদের মধ্যে যেন হতাশা ও আত্ম-অবিশ্বাস কদাচ না আসে। মনুষ্যত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী তোমাদিগকে প্রোথিত করিতে হইবে।

ধনী-গরীব সকল ভাইবোনদের একত্র কর। তাহাদিগকে আশ্বাস দাও, বিশ্বাস দাও, নির্ভর দাও। তাহাদিগকে উৎসাহিত

কর, উদ্দীপিত কর, উজ্জীবিত কর। তাহাদিগকে আশা দাও, উৎসাহ দাও, প্রেরণা দাও। সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহাদিগকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। তাহারা শৃগাল-শাবক নহে, তাহারা সিংহের সন্তান।

নিমেষের জন্যও কেহ ভগবানকে ভুলিও না। নামে প্রেমে জগৎকে মধুময় কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

## (১৪)

হরিওঁ

বারাণসী
৫ই ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মহাদুর্য্যোগের মধ্যেও আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যেমন বিরাম নাই, আমাদের জনসেবা-চেষ্টা তেমন বিরামহীন হইবে। প্রতিটি মুহূর্ত্ত তোমরা কাজে লাগাইয়া রাখ। ঐ ক্ষুদ্র দুর্ব্বল অন্নাভাব-ক্লিষ্ট সাধারণ লোকেরাই এই যুগে অসাধারণ কাজগুলি করিবে।

তোমরা কদাচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। পরমলক্ষ্য ভুলিও না। প্রত্যেকটী প্রাণকে এই দিকে আকর্ষিত কর। সরল প্রাণে, সরল





মনে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে যাহাকে ডাকিবে, সে কিছুতেই দূরে থাকিতে পারিবে না। চাতক যে ভাবে বৃষ্টির এক বিন্দু জল কামনা করে, চকোর যে ভাবে চন্দ্রের এক কণা জ্যোৎস্না কামনা করে তোমরা সে ভাবে চারিদিকে ছড়ানো তোমাদের শত শত ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিকট হইতে তোমাদের মূল লক্ষ্যের সংসিদ্ধির জন্য সহযোগিতার আকুতি জানাও। পাষাণ প্রাণ তোমরা গলাইয়া দাও, কুম্ভকর্ণের ঘুম তোমরা ভাঙ্গিয়া দাও, সকলকে নব আশা, নব উদ্যম সহকারে তোমাদের সমীপস্থ কর।

কোনও কাজকে অসাধ্য বলিয়া মনে করিও না। হিমাচল তোমরা উড়াইয়া দিতে পার, সমুদ্র তোমরা শুষিয়া নিতে পার, যদি কেবল সঙ্ঘ-শক্তিতে বিশ্বাস কর। সকলে এক সঙ্গে একই সময়ে একই কাজে সুশৃঙ্খল ভাবে লাগিয়া যাও এবং তোমাদের এই একপ্রাণতা যেন প্রাণহীন প্রথার অনুসরণ মাত্র না হয়। নিজেদের সর্ব্বশক্তি, সকল বুদ্ধি, যাবতীয় প্রতিভা, সম্যক অধ্যবসায়কে একত্র মিলাইয়া সুদীর্ঘ-কাল-ব্যাপী সুদৃঢ় প্রযত্নে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। পতনের প্রতীকার এই পথে। অভ্যুদয়ের ইহাই পন্থা।

অসাধ্য বলিয়া যাহা আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা অসাধ্য থাকে শুধু আমরা পরিত্যাগ করি বলিয়াই। পরিত্যাগ যদি না করিতাম, মৃত্যুবরণ করিয়া হইলেও করিবই করিব এই পণ

যদি করিতাম, তাহা হইলে ঐ অসাধ্য আর অসাধ্য থাকিত না,—নিশ্চিত সুসাধ্য হইত। এ কথা তোমরা বিশ্বাস করিও।

ভক্তি-বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ কাজ করিবে কিসের বলে? তোমার মন-রূপ ইঞ্জিন হইতে যে ট্রেণ চলিবার বাষ্প তৈরী হইবে, তাহার জন্য চাই বিশ্বাসের কয়লা আর ভক্তির জল। তবে ত' ইঞ্জিন চলিবে! অন্তরের ভক্তি এবং বিশ্বাস কিসে বাড়ে, তার দিকে দৃষ্টি দাও। ভক্তিবলে বিশ্বাস-বলে প্রত্যেকে বলীয়ান্ হও। তোমাদের অনেকের মধ্যে উৎকৃষ্ট উপাদান রহিয়াছে কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস বড় কম। তোমাদের চিন্তাশক্তি আছে, কর্ম্মক্ষমতা আছে, সৎকাজে অল্পাধিক অনুরাগও আছে কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাসের গভীরতা অতলস্পর্শী নহে বলিয়া এত সব যোগ্যতা থাকিতেও তোমরা অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছ। যেই একটুখানি ত্রুটির জন্য তোমাদের এতগুলি সদগুণ মাঠে মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই ত্রুটিটুকুর তোমরা দ্রুত সংশোধন কর।

তোমরা ঈশ্বর-সাধনায় নিয়মানুবর্ত্তী হও। হাজার কাজের মাঝেই পরমেশ্বরের নামে মনকে বাঁধিতে হইবে। একাজ কঠিন হইতে পারে কিন্তু অসম্ভব নহে। ঈশ্বর-চিন্তন যার যত কম, তার প্রেম তত অবাস্তব। প্রেমিক না হইলে কাজ করিবে কিসের বলে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**





**(১৫)**

হরিওঁ

বারাণসী
৬ই ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যে পার্ব্বত্য টিলাটিতে কিছুকাল যাবৎ জীবিকা-সূত্রে অবস্থান করিতেছ, একদা সেখানে আমি, সাধনা এবং আমার সহকর্ম্মিগণ শুষ্ক মূলীবাঁশের মশাল জ্বালাইয়া পথ আলোকিত করিয়া তোমার বহু পাহাড়ী ভাবী গুরুভাইদের দ্বারা নৌচালিত হইয়া পাথর, কাঁকড়, বন-জঙ্গল ডিঙ্গাইয়া উপনীত হইয়াছিলাম। সেখানে সেদিনই সম্ভবতঃ ইতিহাসের প্রথম পাতা লিখিত হয়। যাহারা নিজেদিগকে পশু বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত ছিলি, তাহারা সেদিনই সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মমন্ত্র কাণে শুনিতে পায়। এখন সেখানে সমতল হইতে তোমরা কতজন গিয়াছ, হাট বসিয়াছে, বাজার বসিয়াছে, বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, নিদ্রিত পাহাড়ের ঘুম ভাঙিতে চলিয়াছে। আমরা যে কাজ সুরু করিয়া আসিয়াছিলাম মান্ধাতার আমলে, সেই কাজ আজ তোমাদের চালু রাখিতে হইবে।

নিকটেই সহরের মত পাহাড়ী একটী অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। অল্প কয়েকজন কর্ম্মী অনিয়মিত ভাবে মণ্ডলীর কাজ চালু রাখিয়াছে। চিনি ভিয়ানে বসানো হইয়াছে। এখনও দানা

বাঁধে নাই, মিশ্রি হয় নাই। কিন্তু মণ্ডলী একবার কোথাও স্থাপিত হইলে উনানের আগুনটা যদি নিভিয়া না যায়, তাহা হইলে কখনও বেদম জ্বলিয়া কখনও নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ভিয়ান হইতে দানাদার মিশ্রির চড়া নামাইয়া দেয়। তোমাদের ওখানেও অবস্থা তাহাই হইবে। কোনও প্রকারে একটী অখণ্ডমণ্ডলী গঠন কর। আস্তে আস্তে উহা কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাটিতে শিখিবে। কিন্তু কালক্রমে তাহা এক সিংহ-সাহসিক সজীব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

মণ্ডলী স্থাপন কর এবং মণ্ডলীরূপ প্রতিষ্ঠানটীকে তোমার গুরুবিগ্রহ বলিয়া জান। আমি যে তোমাদের প্রতিটি সমবেত উপাসনায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি, এই কথাটী বিশ্বাস কর। যেমন তেমন করিয়া একটী মণ্ডলী গড়িয়া লইয়া তাহার মধ্য দিয়া তোমাদের সাঙ্ঘিক অনুশীলনকে সর্ব্বোচ্চস্তরের সাত্বিকতায় রসসিক্ত কর। একা একা কাজ না করিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া কাজ করিবার দিকে তোমাদের রুচি ধাবিত হউক। প্রত্যেকের শক্তি একস্থানে আনিয়া একই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বজনীন কুশল সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের হৃদয়ের আনন্দ উল্লসিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**





**(১৬)**

হরিওঁ বারাণসী

৭ই ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নূতন করিয়া জীবনের প্রত্যেকটী বিষয়কে চিন্তা করিতে সুরু কর। পুরাতনের কচায়নে বৃথা লক্ষভ্রষ্ট হইও না।

তোমাদের সকল কর্ম্মশক্তিকে সকলের কর্ম্মশক্তির সহিত মিলাইয়া তোমরা নূতন অভিযানে আগুয়ান হও। অতীতে অসাধ্য-সাধন তোমরা অনেক করিয়াছ, পুনরায় নূতন করিয়া অসাধ্য-সাধন কর।

ছোটবড় সকলকে মান-অভিমান ভুলাইয়া ধনি-দরিদ্র সকলকে ভেদাভেদবুদ্ধি বিস্মরণ করাইয়া, দাতা ও কৃপণ সকলকে একত্র মিলাইয়া, পরস্পর-বিবদমান সকলকে পূর্ব্বক্লেশ, অতীত সন্তাপ ভুলাইয়া কাজে লাগাইয়া দেখ যে, কি বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যাহার মনে যেই ব্যথা থাকুক, দুঃখ থাকুক, অনুযোগ থাকুক, অভিযোগ থাকুক, সব তোমরা স্নেহ ও ক্ষমার বলে ভুলাইয়া দিয়া প্রতিটি ভ্রাতা ও ভগিনীর মন একাভিমুখী কর। ইহা তোমাদের বৃহৎ কর্ত্তব্য, মহৎ দায়িত্ব।

অনেক ব্যাপারেই দেখা যায়, মেয়েদের শক্তি ছেলেদের শক্তি অপেক্ষা বেশী, যদিও এই শক্তির স্বীকৃতি পুরুষেরা

প্রকাশ্যভাবে বড় কেহ দেন নাই। কিন্তু আমি এই শক্তিতে বিশ্বাস করি, এই শক্তিকে সম্মান করি। তোমরা মহাশক্তি-স্বরূপিনী হইয়া প্রত্যেকে কাজে লাগ।

ঝগড়া-কলহের আবহাওয়াটা সহর হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। অতীতের দোষানুসন্ধান ও দোষচর্চ্চা ভুলিয়া গিয়া সকলকে মহৎ কর্ত্তব্যের ডাকে একত্র কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (১৭)

হরিওঁ বারাণসী

২০শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। বৃহৎ কাজে ক্ষুদ্র সহযোগকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিতে নাই। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহযোগ মিলিত হইয়াই একটা বৃহৎ সাফল্যের জন্ম দেয়। ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিব তখন, যখন ক্ষুদ্রের পুরুষানুক্রম বা পরিণতি বৃহতের দিকে ধাবিত হয় না। প্রাচীন ভারতে শূদ্র বা অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের বংশ-সৃষ্টি করিতে কি দেখা যায় নাই? ভবিষ্যতে কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৃহত্তর, মহত্তর, দুর্ব্বারতর কোন্ শক্তির আবির্ভাব ঘটিবে, তাহার উপরই বর্ত্তমানের ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব বা মহত্ব নির্ভর করে। মহৎ উদ্দেশ্যে তুচ্ছ সেবা, তুচ্ছ দান ক্ষুদ্র ও নহে, তুচ্ছও নহে। চিত্তের শুদ্ধতাই দানের মাধুর্য্য,





দানের কৌলীন্য। দান ক্ষুদ্র হইতে পারে কিন্তু তাহা কুলীন হইবে না কেন? কিন্তু যে-কেহ কিছু দান করিলেই কি গ্রহণ করা যায়?

মানুষের প্রাণ জাগাইতে পারিতেছ না বলিয়া আফশোষ করিও না। আজ যাহাকে নির্জীব নিস্প্রাণ দেখিতেছ, তাহারই পশ্চাতে লাগিয়া থাক। হতাশ হইও না, হাল ছাড়িয়া দিও না। সংসারের মোহে কেহ পরম কর্ত্তব্য ভুলিয়া থাকিতেছে বলিয়াই তুমিও উদাস নেত্রে তাহার উদাসীনতাই প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে, ইহা হইতে পারে না। তোমার ভিতরে যে প্রাণ-শক্তি রহিয়াছে, তাহার নিত্য জাগৃতিতে প্রত্যয়বান্ হও। তারপর কাঠ-পাথরের ন্যায় নির্জীব হৃদয়গুলির দুয়ারে যাইয়া বারংবার আঘাত কর। আঘাত করিতে করিতে একটা একটা করিয়া দুয়ার খুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। একথা বিশ্বাস কর।

ক্ষমতা অক্ষমতা তুচ্ছ ব্যাপার। প্রাণবত্তাই বড় কথা। ক্ষমতা যাহার আছে, সে কোনও-না-কোনও সময়ে প্রাণবান্ হইবে, এই বিশ্বাস করিও। প্রাণবত্তা যাহার আছে, সে কোনও-না-কোনও সময়ে সক্ষম হইবে, ইহাও বিশ্বাস করিও।

সকলকে ডাকিয়া খুঁজিয়া টানিয়া আনিয়া সৎকার্য্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবার প্রয়াসের ভিতরে যে মহত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা লোকত্রাতার। সকল মহদনুষ্ঠানে অর্থের প্রায়োজন হয় না। সমবেত উপাসনা করিতে কিসের অর্থব্যয় প্রয়োজন? ভক্ত মুসলমানরা যখন সমবেত ভাবে নমাজ পড়েন, তখন কি

তাঁহাদের কাহারও অর্থব্যয়ের চিন্তা করিতে হয়? যিনি আজান গাহিয়া তারস্বরে সকলকে আহ্বান-বাণী জানান, তিনি যে কতবড় লোকহিতকারী মহৎ ব্যক্তি, ভাবিয়া দেখ। ভগবানের দুয়ারে ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া অপরাপরেরা ত্বরিত ওজু করিয়া, শুচি হইয়া নমাজের জায়গায় গিয়া হাজির হন। আজান শুনিবামাত্র যে সকলকে নমাজের ক্ষেত্রে পৌছিতে হইবে, এই রুচিটি ভক্ত মুসলমানদের মনে যাহারা অবিরাম সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারাই কি কম মহৎ? ডাক শুনিলে আসিতে হইবে, সকলের মধ্যে এই মনোবৃত্তিটি সৃষ্টি করা একটি সুমহৎ পুণ্য কর্ম্ম। আবার সময় মতন সকলকে ডাকিতে হইবে, সকলকে না ডাকিয়া একা একা নিজের সাধন নিজে করিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে চেষ্টিত হইব না, এই ভাবটি অন্তরে পোষণ করাও একটি সুমহৎ পুণ্য কর্ম্ম। ভগবানের নামে তোমরা সম্মিলিত হও এবং তোমাদের সম্মিলনের ফললব্ধ পার্থিব ও অপার্থিব উভয়বিধ শক্তিকে জগজ্জনের কল্যাণে প্রয়োগ করিয়া ধন্য হও, সার্থক হও।

সংঘশক্তি এক মহাশক্তি। সকলে মিলিলে অসাধ্য সাধন করা যায়। তাহার জন্য গুরুতর কোনও আয়োজন করিতে হয় না। সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্র করা একটা মহতী সাধনা। এই সাধনায় তোমরা সিদ্ধ হও। প্রত্যেকে প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত কর। সমস্ত দেশ দুরন্ত আর্থিক ক্লেশের মধ্য দিয়া যাইতেছে।





কিন্তু ক্লিষ্ট দরিদ্রেরাই সংঘবদ্ধতার ফলে অসাধ্য সাধন করিবে। কেহ দরিদ্র বলিয়া কাহাকেও অবহেলা করিও না। কেহ দুর্দ্দশাগ্রস্থ বলিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইও না। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, দরিদ্রদেরই প্রাণের বল বেশী হয়।

যে সকল ধনবান্ তোমার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন এবং সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে যাঁহাদের সহযোগ দাবী করিবার অধিকার তোমার আছে বলিয়া মনে করিতেছ, তাঁহারা সৎকর্ম্মে উদাসীন হইলেও তোমার যেন অবজ্ঞার পাত্র না হন। ধনের প্রাচুর্য্য সামলাইতে না পারিয়া যাহারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান হইতে আলাদা করিয়া ফেলিয়াছে, একমাত্র ধনাঢ্যতার কারণে তাহাদের ভিতরে সংসার মদমত্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। ধনের সদ্ব্যবহারই যে ধনাঢ্যতা লাভের সার্থকতা, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি রুষ্ট, রুক্ষ না হইয়া অধিকতর দয়ার্দ্র-চিত্ত হও। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর, তাহাদের ধনান্ধতা দূর হউক, সংসারের প্রতি নিদারুণ লিপ্ততার অবসান হউক। উপদেশের দ্বারা তাহাদের সেবা করিতে যাইও না। কেননা, উপদেশ ইহারা হিতবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে না, বরং আহত হইবে। ইহাদের জন্য অবিরাম পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাও। প্রার্থনার শক্তিতে আস্তে আস্তে অনেক অবাধ্য মানব তোমাদের অনুগত হইয়া পড়িবে। এই কথাগুলি যদি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করা

সত্য না হইত, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে ইহা উচ্চারণ করিয়া শুনাইতাম না।

সহকর্ম্মী রূপে অধিক লোককে পাও নাই। কিন্তু ইহা ত' সত্য যে, একটি পুরুষ এবং দুইটি মহিলা অকুণ্ঠ সেবা দিয়াছেন। যে কারণে এই একটি পুরুষ এবং দুইটি মহিলা কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার সঙ্গী হইলেন, সেই একই কারণে অদুর ভবিষ্যতে আরও বহু পুরুষ এবং আরও বহু মহিলা তোমাকে সহযোগ দিতে আসিবেন। নিজের অন্তরের কর্ম্মাগ্রহকে কদাচ দুর্ব্বল, শিথিল, বিক্ষিপ্ত বা স্তিমিত হইতে দিও না। এই একটি মাত্র সর্ত্ত পালন করিতে পারিলেই তুমি সমগ্র বিশ্বকে তোমার দিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে।

কাজ করিয়া মান-যশ লাভ হউক, এই লোভটি রাখিবে না। কাজ যে করে, মান-যশ-প্রতিপত্তি তাহার আপনি হয়। মান-যশ-প্রতিপত্তি না পাইলেও সে কাজ করে। মান-যশ-প্রতিপত্তির লোভে যে কাজ করে, অনেক সময়ে কাজ করিতে গিয়া সে অকাজ করে। ঈশ্বরের প্রীতিসম্পাদন তোমার লক্ষ্য হউক, জগজ্জনের কল্যাণ-সাধন তোমার ব্রত হউক, অন্য সকল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে ইহার অধীন করিয়া রাখ। লক্ষ্যকে কখনও ছোট, উদ্দেশ্যকে কখনও সঙ্কীর্ণ, চেষ্টাকে কখনও এক দেশদর্শী এবং বিশ্বাসকে কখনও ক্ষুন্ন হইতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ





## (১৮)

হরিওঁ বারাণসী
২০শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের পত্রও পাইতেছি, স্থানীয় সকল সংবাদও পাইতেছি। কিন্তু একটি কথা ছাড়া জবাব দিবার দ্বিতীয় আর কথা নাই। তাহা হইতেছে—লাগিয়া থাক। হতাশ হওয়াও ভুল, অভিমান করাও ভুল। বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, পরিণামে তোমাদের চেষ্টার সফলতা আসিবেই এবং আজ যাহারা গর্ব্বভরে দূরে সরিয়া থাকিতে চাহিতেছে, আজ যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ তোমাদের আহ্বানে কাণ দিতেছে না, তোমরা যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া প্রত্যেককে আহ্বান-বাণী শুনাইয়া যাইতেছ, একমাত্র তাহারই প্রতাপে একশত বৎসর পরে আবির্ভূত ইহাদের বংশবাহকেরা একটা অবধি প্রাণী তোমাদের আদর্শের অনুগত হইবে। শ্রদ্ধা রাখিও তোমার আদর্শের শাশ্বত মূল্যায়নে, আর বিশ্বাস রাখিও পরমেশ্বরে।

আমি সারাদিন কাজ করি, প্রতিদিন কাজ করি। সুস্থ অথবা রুগ্নাবস্থায় কোনও সময়েই আমার কর্ম্মের বিরাম নাই। এই অসাধারণ-নিষ্ঠা-সহকৃত কর্ম্ম-পরম্পরা কৈ অসামান্য কোনও সফলতার কনক কিরীট মস্তকে ত' ধারণ করিতে পারিল না। ইহা দেখিয়া অন্য লোকে হতাশ হইতে পারিত। মুখের ভাষা

যেদিন ভাল করিয়া ফোটে নাই, সেদিন হইতে কাজে নামিয়াছি। আর আজ যখন পরমায়ুর অরুণ-রথ পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখনও কাজই করিয়া যাইতেছি। এমতাবস্থায় জাতির জীবনে নবেতিহাসের মঞ্চরচনা দেখিতে না পাইলে হতাশা প্রকাশের সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে বৈ কি? কিন্তু হতাশা আমার নাই। আজ যেই কথাটি বলিয়াছি, তাহা কি আজিকার আকাশেই মিলাইয়া গেল? গতকাল যেই কাজটুকু করিয়াছিলাম, তাহা কি অনন্ত কালের মরুভূবক্ষে শিশিরবিন্দু সম শুষিয়া গিয়াছে? তাহা নহে। প্রভাতের নয়না-শ্রুকণা মরুভূমির বক্ষভেদ করিয়া অনেক গভীরে চলিয়া গিয়াছে। একদা উহাই ভূগর্ভস্থ প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া তীব্র বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ফোয়ারার মত ছড়াইয়া পড়িবে সমগ্র বিশ্বে,—পাথর ফাটাইবে, কাঁকড় পচাইবে, বিস্তীর্ণ বালুকারাশিকে নরম মৃত্তিকায় পরিণত করিবে, রুক্ষ, বন্ধ্যা ধরণীকে শ্যামলিমায় চিরতরুণ করিবে। মুগ্ধ হইয়া বিশ্ববাসী তাহার দিকে সশ্রদ্ধ নয়নে তাকাইতে বাধ্য হইবে, তাহাকে ভালবাসিবে, তাহাকে প্রণাম করিবে।

আজিকার সাধনা আজিই শেষ হইয়া গেল না। আপাততঃ কোনও মনোহারিনী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে না বলিয়া হতাশ হইও না। হতাশাও এক প্রকারের মৃত্যু। নিদ্রাকে এক ফরাসী লেখক মৃত্যুর নিরাপদ সহোদর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার সহিত আমি আর একটি কথা সংযুক্ত করিতেছি যে,





হতাশা মৃত্যুর আপদাস্পদা সহোদরা। হতাশ হইলে কি মরিলে। কোনও অবস্থাতেই আশা পরিহার করিও না। আশাকে কুহকিনী বলা হইয়াছে কিন্তু তোমার আশা দুরাশা নহে যে, ইহাকে কুহকিনী বলিয়া ইহার মায়ার ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তোমাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে।

জীব-জগতের কল্যাণের জন্য তোমার দেহ-ধারণ। সর্ব্ব-জীবেশ্বর জগৎপতির চরণ-সেবার জন্য তোমার ভগবৎ-সাধন। নিজের অস্তিত্বটুকুকে অনন্তকোটি খণ্ডে চূর্ণীকৃত করিয়া দিয়া বিশ্ববাসী সকলের আত্মার আত্মায় এক হইয়া মিলিয়া যাইবার জন্য তোমার জীবনব্যাপী সমস্ত আয়োজন। প্রচলিত নীতিকথা বা প্রথাগত তত্ত্ব তোমার জন্য নয়।

যাহাদিগকে সহকর্ম্মী বা নেতৃত্ব প্রদর্শনের যোগ্য বলিয়া ভাবিতেছ, তাহারা তোমাদের একটী ডাকেও সাড়া দিতেছে না, ইহা নিশ্চিতই দুঃখজনক। কিন্তু আজ ইহারা সাড়া দিতেছে না বলিয়া কালও অসাড় মৃতদেহের মতন পড়িয়া থাকিবে, এই ধারণা তুমি কেন করিবে? ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে লইয়া তোমার পূজা-আয়োজন, একজনকেও পিছনে ফেলিয়া তুমি একাকী মোক্ষলাভ করিতে আগ্রহী নহ। এই কথাটী অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিও। পাথরের ভিতরেও প্রাণ সঞ্চারিত করিতে হইবে। বৃক্ষলতার মুখেও বাক্‌স্ফুরণ করাইতে হইবে। জীবজন্তুর ভিতরেও মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই তোমার পণ হউক। পণ যাহার উত্তম, মন তাহার দুর্ব্বল হইবে কেন?

ক্ষণকালের জন্যও ঈশ্বর-বিশ্বাস হারাইও না। ভগবানকে যদি না ভোল, তবে এজগতে তোমাদের ভয় করিবার কিছু নাই। কেবল পথ খোঁজ, ঈশ্বর-নিষ্ঠা নিয়ত কিসে বাড়ে। অন্তরে কেবল আকুল আবেগ জাগাও, তোমাদের ঈশ্বরানুরাগ এমন প্রভাব অর্জ্জন করুক যেন বিনা উপদেশে একমাত্র তোমাদের স্পর্শ বা দর্শনমাত্র মানুষের মধ্যে ঈশ্বরানুরাগ সঞ্চারিত হয়। ইহাই পথ। বাকী সব বিপথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ বারাণসী
২০শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজেকে কখনও সামান্যা নারী বলিয়া জ্ঞান করিবে না। নিজেকে অন্তরে অন্তরে অসামান্যা মহাশক্তি বলিয়া জানিবে এবং এই বিশ্বাসে ভরপুর মন লইয়া সকলের ভিতরে কাজ করিতে নামিয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে, অপর নারীরাও মহাশক্তি কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা নিদ্রায় কালাত্যয় করিতেছে। তাহাদের ভিতরে এমন শক্তির সঞ্চার কর যাহাতে তাহারা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করে। মানুষকে সৎকাজে আহ্বান করা এক সুমহৎ পুণ্য। মানুষকে





সৎকাজে সংযোজিত করিয়া দেওয়া তদপেক্ষাও পুণ্যতর অনুষ্ঠান। সৎকাজে একবার কেহ হস্ত-সংযোগ করিলে যাহাতে আলস্য অবসাদ বা আত্মঅবিশ্বাস হেতু ধরা কাজ সহসা ছাড়িয়া না দেয়, তাহার জন্য তাহার অন্তরে নিয়ত উদ্দীপনা যোগাইয়া যাওয়া মহত্তম পুণ্যানুষ্ঠান।

তোমরা মনে প্রাণে ঈশ্বরানুরাগী হও। তোমাদের নিজ নিজ অন্তরের ভক্তিকে এমন প্রগাঢ় কর, যেন বোমা মারিয়াও কেহ ইহাতে ফাটল ধরাইতে না পারে। ঈশ্বরে ভক্তি অবিচলিত হইলে ভক্তের অন্তরের সংগুপ্ত ইচ্ছা বহুজনের মনের দীর্ঘকাল-সঞ্চিত গ্লানি ও মালিন্য দূর করিয়া দিতে পারে।

দিনে রাত্রে সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর স্মরণ কর। সুখে দুঃখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের আশ্রিত হইয়া চল। তাঁহাকে তোমার প্রাণারাধ্য প্রাণারাম বলিয়া জান। তাঁহার নাম জপিতে জপিতে এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হও যে, তাঁহার মধ্যেই নিখিল বিশ্ব বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেবাই বিশ্বের সেবা, বিশ্ববাসীর সেবাই তাঁহার সেবা। বিশ্বে ও তাঁহাতে পরিপূর্ণ অভেদ-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়া তুমি তন্ময় হইয়া যাও। তিনি তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যদিয়া তোমার হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও উপেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া যাইতে থাকুন। ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া জীবন যাপন যে কি নিদারুণ বিড়ম্বনা, তাহা সম্যক্ জানিয়া নিজেকে একান্ত ভাবে ঈশ্বরানুগত কর। তোমার বহির্ম্মুখ কর্ম্ম-সাধনা এবং অন্তর্মুখ

তপঃ-প্রেরণা উভয়ে মিলিয়া গাঙ্গ্যপ্রবাহিনীর সাগর-সঙ্গম সৃষ্টি করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

(২০)

হরিওঁ বারাণসী
২০শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিরন্তর ভগবানের নামের সেবার মধ্য দিয়া ভক্তি ও শক্তি আহরণ কর। ভক্তির ফল ঈশ্বরানুগত্য, শক্তির ফল জনসেবার আগ্রহ। যেই যুগে ভক্তি-পথাশ্রয় করিতে হইলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইত, এমন কি পরিত্যাগ করিতে হইত লোক-কল্যাণ কর্ম্মও, সেই যুগ বহুকাল হয় চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে তোমাদিগকে একাধারে শক্তিমান ও ভক্তিমান হইতে হইবে। ভক্তিহীনের প্রাণ ঊষর মরুভূমিতুল্য শুষ্ক এবং হাহাকারপূর্ণ, শক্তিহীনের প্রাণ বিশ্বাস-বর্জ্জিত, উদ্যম-রহিত, প্রজল্পে নিরত মিথ্যাচারী। সুতরাং ভক্তি এবং শক্তি উভয়ই তোমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে এবং তাহার মুলীভূত পন্থা হইতেছে নিরন্তর ঈশ্বর-স্মরণ।

ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া জীবন যাপন বড়ই ক্লেশকর। জীবনে মানুষ যতই দুঃখ পাউক না কেন, ঈশ্বর-স্মরণ তাঁহার অন্তরে





শান্তি প্রলেপের কাজ করে। তোমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরানুরাগী হও এবং অপর সকলকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা কর। সহস্র বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াও যদি জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিতে চাহ, তবে নিত্যকাল ঈশ্বরাশ্রিত থাক।

ঈশ্বর-ভজনের কত রকমের পন্থা এ-জগতে কতজন আবিষ্কার করিয়াছেন। সকল পন্থার প্রতিই আমার অন্তরের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা। কিন্তু তন্মধ্যে সেই পন্থাই শ্রেষ্ঠ, যাহা ঈশ্বরের সহিত তাঁহার আশ্রিতের নিয়ত সান্নিধ্য উপলব্ধি করাইয়া থাকে। পরমেশ্বর আপাততঃ তোমার নিকটে অদৃশ্য কিন্তু তিনি তোমার কাছ হইতে দূরে নহেন। তিনি তোমার শ্রবণ-শক্তি হইয়া কর্ণে, দৃষ্টি-শক্তি হইয়া নয়নে, ভালবাসার শক্তি হইয়া অন্তরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। যতবার ভগবানকে ডাকিবে, ততবারই এই কথা স্মরণ করিবে যে, তিনি তোমার। তিনি তোমার কেবল এইটুকুই নহে, তুমিও তাঁহার। তুমি তাঁহার ইহাই শেষ কথা নহে। তিনি ও তুমি এক অভেদ সত্তা, এক অভিন্ন রস, এক অদ্বয় মিলন, এক অদ্বৈত প্রেম-নাটিকা, ভাষার ছটায় এ তত্ত্ব বুঝাইতে পারিব না। ভাবিতে ভাবিতে যখন তন্ময় হইয়া যাইবে তখন ইহা বুঝিবে।

ঈশ্বরের প্রেম শক্তিরূপে অন্তরে জাগরিত হইলে ইহা দ্বারা কেবল তোমারই মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে না, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর বন্ধন-মুক্তি ঘটিয়া যাইবে। মহামুক্তির

সেই বিচিত্র সমারোহ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, যাহা কোনও দেশের কোনও শাস্ত্র আজ পর্যন্ত অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পারে নাই।

সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পথ চল মা। লক্ষ্যটুকু স্থির থাকিলে অজানিতে তোমার পদদ্বয় এমন জায়গাতেই পড়িতে থাকিবে, ঠিক যেইখানে তোমার পদসঞ্চালন সঙ্গত।

অন্তরভরা ঈশ্বর-প্রেম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামো। তোমার প্রেম সহস্র প্রেমিককে প্রেমের তরঙ্গে আন্দোলিত করিয়া তুলুক। অবিশ্বাসীর অন্তরে আসুক বিশ্বাস, অশান্তের অন্তরে জাগুক আশ্বাস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

**(২১)**

হরিওঁ

বারাণসী
২১শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সরকারী চাকুরী যখন লইয়াছ, তখন মাঝে মাঝে বদলির হুকুম হইবেই এবং তাহা তামিলও করিতে হইবে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়াকে গুরুতর কোনও অনিষ্টসাধক ব্যাপার বলিয়া মনে করিও না; বিশেষতঃ চাকুরী করা, অর্থোর্জ্জন করা, সংসার প্রতিপালন করা এবং কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকা, ইহাই যখন তোমার একান্ত লক্ষ্য নহে, মানুষের মধ্য দিয়া





ভগবানের সেবা আর ভগবৎ-সাধনার মধ্য দিয়া মানুষের সেবা করা, ইহাই যখন জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া দীক্ষার ঘরে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে, তখন একস্থান হইতে অন্যত্র বদলির হুকুম পাইলে উহাকে নির্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখিও। চেষ্টা করিও ভাল জায়গায় যাইতে এবং যে স্থানে গেলে তোমার দ্বারা মানব-কল্যাণ-কর্ম্ম ত্বরান্বিত হইবে, সেই স্থানকেই ভাল জায়গা বলিয়া জ্ঞান করিও। যে স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছ, সেই স্থানের মানুষের ভিতরে একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করিতে, তাহাদের মন হইতে লক্ষ্যহীনতা বিদূরিত করিতে, তাহাদের সাহস, শৌর্য্য, চরিত্রবল বর্দ্ধিত করিতে যদি কিছু করিয়া থাক, তবে স্থানত্যাগে তোমার আপশোষের কিছুই নাই। যে কাজ তুমি এখানে সুরু করিয়া দিয়া গিয়াছ, সে কাজ তাহার নিজ দৈব মহিমায় আপনা আপনি চলিতে ও বাড়িতে থাকিবে।

এই যুগে চিকিৎসকদের উপরে সামাজিক কর্ত্তব্যের রূপ ধারণ করাইয়া একটী অপকার্য্য সুপ্রচলিত করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় রাজকীয় আড়ম্বরে দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চালান হইতেছে। আমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের কথা বলিতেছি। অতীব বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিতান্ত নির্ব্বোধের মতন গোড়াতেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, মানুষ নিজের ভোগ-বাসনাকে দমন করিয়া সংসার-জীবনে চলিতে সমর্থ নয়,—সুতরাং দেশব্যাপী জন্ম-সংখ্যার ভীতিজনক হার কমাইতে হইলে যান্ত্রিক পথে চলিতে হইবে, শরীরের সংগুপ্ত স্থানে সন্তান-জনন ক্ষমতা বা সন্তান-ধারণ ক্ষমতা লুপ্ত

করিয়া দিতে হইবে যেন দম্পতির মৈথুনাচার বেপরোয়া এবং বিশৃঙ্খল ভাবে চলিলেও নূতন নূতন ক্ষুধার্ত্ত শিশুরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অপরাপরের কষ্টার্জ্জিত অন্নগ্রাসের উপরে ভাগ বসাইয়া দেশের অন্ন সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলিতে না পারে। এইখানে মানুষ যে তাহার দেবত্ব-সম্ভাবনার পথে পদ-সঞ্চারণার মুখে, শরীরের পেশীতে পেশীতে পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিয়া দিল, ঊর্দ্ধমুখ গতি লইয়া যেই চরণদ্বয় চলিতে পারিত, তাহার জানুতে, জঙ্ঘায় খিল ধরাইয়া দিল, এই কথাটা কাহারো মনে জাগিল না। বলিল,—"আত্ম-সংযম মানুষের সাধ্য নয়, ঐ রাস্তায় চলিলে কদাচ জন্ম-সংখ্যার হ্রাস করা যাইবে না।" বলিল,—"যাহারা সংযমের রাস্তাকে জন্ম-শাসনের উপায় বলিয়া ভাবিতেছে, তাহারা ভাববিলাসী ভ্রান্ত।" বলিল,—"স্বামিস্ত্রীতে মিলনের মুখে নৈতিক বিচারের কীলক বসাইয়া তাহাদের স্বাভাবিক আদান-প্রদান রুদ্ধ করিয়া দিলে ইহা তাহাদের জীবনে সৃষ্টি করিবে অপ্রণয় এবং স্বাস্থ্যে সৃষ্টি করিবে মহাপ্রলয়।" এই সকল ধীমান পুরুষেরা এবং ধীমতী নারীরা নিজেরা কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল না যে, চেষ্টা করিলে দাম্পত্য জীবনে সংযম পালন সম্ভব কি না, সহজ কি না।

তুমি নিজে চিকিৎসক। মানুষের দাবীর মুখে পড়িয়া কত মূর্খ নরনারীকে হয়ত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিলাতী বিদ্যা শিখাইতে বাধ্য হইয়াছ, কিন্তু তথাপি নিজে সেই পথটীতে যাও নাই। ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাস করিয়াছ। ইহা যে তোমার কতবড় কৃতিত্ব,





তাহা কি বলিব। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে, বিবাহিত জীবনে সংযম-পালনের চেষ্টা সম্ভব। দুই চারিবার পরাজয় স্বীকারের পরে অনায়াসে বিজয়ের রথে আরোহণ করা যায়, বিজয় কিরীট মস্তকে ধারণ করা যায়। তুমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে, এই শুভ চেষ্টায় অল্পায়াসে পত্নীর সহায়তা পাওয়া যায় এবং তাহার সহায়তা পাইলে এই সুদুরূহ ব্রত এক সহজ-সাধ্য স্বভাবে আসিয়া পরিণত হয়। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ রতিরস-বর্জ্জিত জীবন সুখরস-বঞ্চিত নহে।

আমার পুত্র-কন্যাদের জীবনে শত শত স্থলে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। আমার বহু বৎসর ব্যাপী প্রচারের ফলে এই একটী পরম সত্য জাতির জীবনে আস্তে আস্তে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। আমি তোমাদেরই জীবনে আমার একদিনের একটী নিবিষ্ট চিন্তার সফলরূপায়ণ লক্ষ্য করিয়া অন্তর ভরা আহ্লাদ অনুভব করিতেছি।

তোমাদের এই ব্রতের কথা বাহিরের লোকের কাছে প্রচার করিও না। এই ব্যাপারে প্রচারশীলতা আসিলে চরিত্রে ভণ্ডামি প্রবেশ করে। সুনাম লোভী বোকার দল নিজেদের জীবনের গুপ্ত অংশের এক অভাবিত সাফল্যকে এই ভাবে দুর্ব্বল এবং মূল্যহীন করিয়া দেয়। তোমরা কয়েক শত দম্পতি নানা অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া নিজ নিজ জীবনের মধ্যে যে দাম্পত্য সংযম পালন করিয়া যাইতেছ, ইহার বিপুল শুভফল লোক-লোচনের অজ্ঞাতসারে তিনশত বর্ষ ব্যাপিয়া পরবর্ত্তী কালের

নবজাতকদের জন্য সংযম-সামর্থ্যের অভিনব অবদান ছড়াইয়া যাইতে থাকিবে। ফলে যে সংযম তোমরা বহু কষ্টের মধ্য দিয়া আয়ত্ত করিতেছ, তাহা তাহারা অনেকটা স্বভাবদত্ত সম্পদ্ রূপে লাভ করিবে। তোমরা যে সংযম-পালন করিতেছ, তাহার উদ্দেশ্য ত' এই নহে যে, ইহার পরে তোমাদের ঘরে আর একটী সন্তানও জন্মিবে না। তোমরা যে সংযম-পালন করিতেছ, তাহার ত' উদ্দেশ্য এই যে, যেই সকল সদাত্মপুরুষের আত্মা পূতিগন্ধময় লিঙ্গনালী দিয়া পূতিগন্ধময় জরায়ুর ভিতর প্রবেশ করিতে রুচিমান হইবে না, মনুষ্যসন্তান রূপে তাঁহাদের আগমনপথ সরল, সহজ ও আকর্ষণীয় করিবার জন্য বংশানুক্রমে সাধনা করিয়া যাওয়া।

তোমরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর, আশীর্ব্বাদ লও।

বিবাহিত দম্পতি যে সংযম-পালনে আগ্রহান্বিত হইবে, তাহার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার কি পরিশোধন প্রয়োজন নহে? চতুর্দ্দিকে যত জনের যত পুত্র বা কন্যা জন্মাইতেছে, সকলেই দিবারাত্র ওর কাছে তার কাছে কেবল শিখিতেছে কুকথা, কেবল দেখিতেছে কুকার্য্য,—ইহার ফলে তাহারা অধিকাংশেই কি আত্মধ্বংসকর দুর্নীতির পথে পদপ্রসারণ করিতেছে না? এই জন্যই পুরুষ কর্ম্মীদের কিশোর ও যুবকদের মধ্যে, মহিলা কর্ম্মীদের তরুণী ও কিশোরীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল ভাব প্রচারের জন্য লাগিয়া যাইতে হইবে। আজ যে তরুণ বা তরুণীকে ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনাইলে, দেখিও, তিন





দিন মধ্যে তাহার স্বভাব-পরিবর্ত্তন সুরু হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত জটিল পাত্রগুলি ছাড়া সর্ব্বত্র তুমি প্রত্যেকটি প্রাণীকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আকুলতায় উদ্বেল করিয়া তুলিতে পারিবে। আমি নিজে আকৈশোর এই কাজ করিয়া আসিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে কিছুদিন মধ্যে যুবকদের মধ্যে পরিবর্ত্তন এবং রূপান্তর ঘটিতে থাকে। না যদি ঘটিত, তথাপি তোমাদিগকে কর্ত্তব্যানুরোধে একাজ করিতে হইত। কেন না, লঘু সাহিত্যের অপরিণামদর্শী রচয়িতারা আর ছায়াচিত্রের ধনলুব্ধ নির্ম্মাতারা যাহাই লিখুন আর যাহাই দেখান, শাশ্বত সত্যকে ইহারা পরাস্ত করিতে পারিবেন না। আত্মজয় করিবার ভিতরে যে আনন্দ রহিয়াছে, সম-সাময়িক অধিকাংশ লোকের তাহার প্রতি অরুচি থাকিলেও কাজ যদি তোমরা করিয়াই যাইতে থাক, শাশ্বত সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

**(২২)**

হরিওঁ

বারাণসী
২১শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার স্বামী তোমাকে প্রেরণা দিয়াছেন, আর তুমি সংযত জীবন-যাপনকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছ, এই দুইটি সংবাদে

পুলকিত হইলাম। সর্ব্বত্র স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে উচ্চাদর্শের পথে টানিয়া আনা আর স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীকে এমন ভাবে সহযোগ প্রদান করা যাহাতে সংযম-সুখ যে সম্ভোগ-সুখ অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্তরের বস্তু, ইহা উপলব্ধি করিতে কোন কুসংস্কারের প্রয়োজন না হয়। গুরুদেব বলিয়াছেন, ইহাই সুখ, অতএব ইহাকে সুখ বলিয়া মানিতে হইবে, তাহা নহে। রিপুর তাড়নায় দেহ যখন আতুর হইয়া অপর দেহের সান্নিধ্য কামনা করে, তখন দেহেন্দ্রিয়ে যে সুখই উপজাত হউক না কেন, আত্মার প্রশান্ত প্রকোষ্ঠে তখন কোথায় স্থিরতা, কোথায় আস্বাদন? তোমরা যে উভয়ে সংযমব্রতে ব্রতী হইয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দের অবধি নাই।

তুমি এখনও দীক্ষিতা হও নাই, ইহাতে কিছু যায় আসে না। যখন প্রত্যক্ষ ভাবে দীক্ষার প্রয়োজন হইবে, দীক্ষা তখন হইয়া যাইবে। আমি তোমাদিগকে দীক্ষা দানের জন্য ব্যস্ত নহি। আদর্শ দানই বড়দান। আমার উপদেশ-বাণী হইতে তুমি যখন উন্নত আদর্শের প্রেরণা পাইয়াছ, তখন শিষ্য হইয়া যাইতে তোমার আর কি বাকী আছে? আনুষ্ঠানিক মন্ত্রদান যখন হইবার হইবে।

নির্ভর আর বিশ্বাস, আগ্রহ আর ব্যাকুলতা, এইগুলি যদি থাকে, সংসারে নানা ব্যাপারেই গুরুর অসীম করুণা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। আমি ত' গুরুভক্তি বাড়াইবার উপদেশ কাহাকেও দেই না। উপদেশ দেই শুধু সাধন-নিষ্ঠা বাড়াইবার।





কাজ করিয়া যাও মা। কাজ করিতে করিতে শুভকর্ম্মের শুভফল দিনের পর দিন আরও প্রত্যক্ষ হইতে থাকিবে।

আমার লিখিত "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" বইখানা যখন পড়িয়াছ, তখন ত' নিশ্চয়ই জান, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি বিবাহিতদের জীবন সম্পর্কে খুব একটা চিন্তাপরায়ণ ছিলাম না। কিন্তু মারাত্মক এক পীড়া হইল। নানাস্থানের কিশোর শিষ্যেরা মুমূর্ষু গুরুদেবকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এই সকল শিষ্যদের অনেকের চোখেমুখে সন্ন্যাসের প্রতিশ্রুতি ছিল। যে দেখিত সে-ই মনে করিত, এমন ছেলেরা কদাচ সংসারী হইবে না। মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখিয়া আমারও ভয় আসিয়া গেল। কে জানে এইসব ছেলেরা আবার ভবিষ্যতে কি জানি করিয়া বসে। ইহারা যদি দল বাঁধিয়া প্রচার করিতে লাগিয়া যায়, গুরুদেব ছিলেন নারীবিদ্বেষী, সংসারী জীবন যাপনকারীদের প্রতি গুরুদেব পোষণ করিতেন সুতীব্র ঘৃণা, তবে ত' সত্যের হইবে অপলাপ, মিথ্যার ঘটিবে জয়জয়কার। অতএব রুগ্ন শরীরে দলিল লিখিতে বসিলাম, এই দেখ আমার "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"। আমি নিজে যতই কঠোর জীবন যাপন করিয়া থাকি না কেন, বিবাহিতদিগকে কদাচ ঘৃণা করি নাই।

পুস্তকও লেখা শেষ হইল, অসুখও সারিতে আরম্ভ করিল। পুস্তক মুদ্রিত হইল, প্রকাশিত হইল, আর মানুষের টিট্‌কারী আহরণ করিতে লাগিল। প্রশ্ন উঠিতে লাগিল,—ইহা কি কখনও হয়। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য কি সম্ভব?

সেদিন বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে মানুষের মনে কোন আন্দোলন ছিল না। দুই একজন বিবাহিত মহৎ ব্যক্তির জীবন-কাহিনী সম্পর্কে যাহা শোনা যায়, তাহাকে মানুষ অলৌকিক ঘটনা বলিয়া মনে করিত এবং এই জাতীয় ঘটনা দেবতা বা ঈশ্বরকল্প পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব, ইহা জ্ঞান করিত। সাধারণ মানুষেও চেষ্টা করিলে গৃহি-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারে, এই কথা উচ্চারণের জন্য আমি কত স্থানে যে উপহসিত আর কত স্থানে যে অপমানিত হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। আজ তোমরা দলে দলে আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য অপরাজেয় সাহস এবং অপরূপ মাধুর্য্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছ। তোমরা মহাদেবী, বিশ্ববাসী সকল নরনারীর প্রণাম তোমাদের ঐ চরণে।

যে ব্রত লইয়াছ, সে ব্রতে সুস্থির থাকিও। সুস্থির থাকিবার উপায় নিরুদ্বিগ্নতা। কোনও অবস্থাতেই মনকে উৎকণ্ঠিত হইতে দিও না। বিঘ্ন, বিপত্তি, অশান্তি প্রভৃতির ভিতরেও যে উদ্বেগবর্জ্জিত মন লইয়া চলিতে পারে, তাহার সংযম-পালন সহজ হয়। নানাবিধ বিরোধ-বিদ্বেষ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া যে চলিতে পারে, তাহার সংযম-পালন সহজ হয়। আমি তোমার চিরবিজয়িনী মহিমময়ীমূর্ত্তি দেখিতে চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**





## (২৩)

হরিওঁ বারাণসী

২১শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান বি— এর পত্রে তোমার কথা জানিলাম। ছোটবেলা হইতে অশেষ দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া জীবনের তিক্ততা ও ভীষণতাকে আস্বাদন করিতে করিতে আসিয়াছ এবং অনেক চেষ্টার পরে আজ কোনও প্রকারে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছ। তোমার অতীতের দুঃখকষ্টরাশির কথা শুনিয়া যেমনই দুঃখিত হইলাম, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছ জানিয়া তেমনই সুখী হইলাম। "সর্ব্বম আত্মবশং সুখম্"। নিজের পায়ে যখন দাঁড়াইয়াছ, তখন নির্ভয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অনুসরণ কর। লক্ষ্যহীন জীবন বৃথা। আদর্শহীন জীবন মিথ্যা। যাহাকে জীবনের পরম কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছ, নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সেই পথে অগ্রসর হইতে থাক।

তোমার অন্তরে চিরকৌমার্য্যের বাসনা ঝলকিয়া উঠিতেছে। এইরূপ কামনা, এইরূপ বাসনা প্রশংসনীয়। কারণ, ইহা দ্বারা নিজের পরিবেশকে সর্ব্বদা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে চেষ্টা যায়। তুমি সর্ব্বদা সঙ্গনির্ব্বাচনে সতর্ক হইও। বিলাস-লাস্যময়ী নারীর সহিত সখিত্ব তোমার সঙ্কল্প-সাধনের অনুকূল হইবে না। চটুলচিত্ত বাচালগণের সংসর্গ তোমার বাসনা-পূরণের

সহায়ক হইবে না। যৌন আবেদনে পূর্ণ কথা-সাহিত্য বা এতজ্জাতীয় ছায়াচিত্র তোমার পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা। প্রেমপূর্ণ অন্তরে নিরন্তর ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাও, যেন তিনি এমন শক্তি তোমাকে প্রদান করেন, যাহাতে জগতের সহস্র চঞ্চলতার ঊর্দ্ধদেশে তোমার মন সতত সঞ্চরণ করিতে পারে। কেশাগ্র হইতে পদ-নখাগ্র পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে। মুখের ভাষা ও মনের চিন্তা যাহাতে সুরুচির স্বাদুতায় সর্ব্বদা পরিষিক্ত থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

চিত্তের শুচিতার এমন একটা স্তর আছে, যেই জায়গায় পৌছিলে নিজের ভিতরে অজ্ঞাতসারে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আসিয়া যায়, যাহাতে চতুর্দ্দিকে ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জন সুরু হইয়া যায়। এইরূপ সময়ে সাবধান থাকিতে হইবে। এই সময়কার সাবধানতা এমন সুকৌশলে অবলম্বন করিতে হয়, যেন মানুষ কল্পনাও না করিতে পারে যে, তুমি সতর্ক আছ। দুষ্ট লোকে যদি বুঝিতে পারে যে তুমি যুদ্ধসজ্জা পরিধান করিয়াছ, তাহা হইলে সে কি ত্বরিত তাহার রণকৌশলের পরিবর্ত্তন-সাধন করিবে না? যোদ্ধা হিসাবে সেই জাতি চতুর, যাহারা সর্ব্বসময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে কিন্তু পৃথিবীর কোন জাতি কল্পনা করিতে পারে না যে, তাহাদের প্রস্তুতির গভীরতা এবং ব্যাপকতা কিরূপ বিস্ময়কর। প্রস্তুতির দম্ভ যাহারা বেশী বেশী করিয়া গাহিয়া বেড়ায়, রণক্ষেত্রে শত্রু কর্ত্তৃক তাহারাই দ্রুত পর্য্যুদস্ত ও পরাজিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত রণক্ষেত্রেই রণ-





কৌশল এক,—সর্ব্বশক্তিকে সর্ব্বশক্তিতে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা উদ্যত রাখা। কিন্তু কাহাকেও বুঝিতে দিও না যে, তুমি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

আমৃত্যু-কৌমার্য্যব্রতধারিণীর পক্ষে ইহা একটা মস্তবড় কথা।

আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবন জগৎকল্যাণের মধ্য দিয়া সার্থক হউক ইতি—

আশীর্ব্বাদক<br>
**স্বরূপানন্দ**

## (২৪)

হরিওঁ

দানাপুর<br>
২৮শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অদ্য সামান্য বেলা থাকিতে দানাপুর পৌছিয়াছি। সন্ধ্যায় স্থানীয় হরিভক্ত সজ্জনেরা আসিয়া নামকীর্ত্তন করিয়া আনন্দ দিয়া গেলেন, নিজেরাও প্রচুর আনন্দ আহরণ করিলেন। ভগবন্নামকীর্ত্তনে যে কি বিমল আনন্দ, তাহা কিছুকাল কীর্ত্তন করিতে করিতে আস্বাদনে আসে। সকল ব্যাপারেই প্রকৃত আনন্দ-রসাস্বাদন করিতে হইলে বারংবার অনুশীলনের অর্থাৎ পদ্ধতিবদ্ধ অভ্যাসের প্রয়োজন। ধ্যানে আনন্দ আছে, জপে আনন্দ আছে, কীর্ত্তনে আনন্দ আছে, কর্ম্মেও আনন্দ আছে।

সেই আনন্দকে অধ্যবসায়ের বলে আস্বাদন করিতে হয়। ইক্ষুতে শর্করা আছে কিন্তু সেই শর্করার রসাস্বাদন করিতে হইলে বারংবার চর্ব্বণের প্রয়োজন।

তোমরা প্রত্যেকে আনন্দময় হইয়া যাও। আনন্দের আস্বাদন করিতে করিতে তোমরা প্রতিজনে চিদানন্দ-সত্তায় রূপান্তরিত হইয়া যাও। কামানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে মানুষ কাম-স্বরূপ হইয়া যায়, প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে মানুষ প্রেম-স্বরূপ হইয়া যায়। তোমরা প্রেম-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপিনী হও। প্রেম তোমাদের লক্ষ্য হউক, প্রাপ্তি হউক, সাধ্য হউক, সাধন হউক, জীবন হউক, উপজীব্য হউক।

অবশ্য, কাম কোনও আলাদা বস্তু নহে। ইহা প্রেমেরই এক বিকার। বিকার বলিয়াই ইহা দুঃখদ। কাম প্রেমের স্বরূপ হইলে দেহে, মনে বা আত্মায় কোনও দুঃখের, ক্লেশের, তাপের আঁচমাত্রও লাগিত না। কিন্তু কাম দুঃখ দেয়, ক্লেশ আনে, সন্তাপের সৃষ্টি করে। এই জন্যই আচার্য্যেরা তোমাদিগকে কামের অধীন না হইতে এবং কামের ঊর্দ্ধে বিরাজমান থাকিতে বারংবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা যাহা যখন বলিয়াছেন, তোমাদের হিতের জন্যই বলিয়াছেন।

তাঁহারা হিতের জন্য বলিলেও তোমরা তাঁহাদের প্রত্যেকটী কথারই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে, এতটা আশা করা যায় না। যে যুগে যে পরিস্থিতির দাবীতে যেরূপ আধারকে উপলক্ষ্য করিয়া যেই উপদেশবাণীটী তাঁহাদের কণ্ঠে স্বরিত হইয়া





উঠিয়াছিল, সেই যুগ, সেই পরিস্থিতি বা আধারের সেই বিশেষত্ব এখন সর্ব্বাংশে অথবা ক্ষীণাংশেও হয় ত' নাই। এমতাবস্থায় তৎকালে উচ্চারিত উপদেশ-বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ করা সহজ নহে। সেই জন্যই, যেই যুগে যিনি যে মহাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই বাণীর সম্পর্কে তৎকালীন প্রয়োজনের দাবীকে সর্ব্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়াও তাহার মধ্যে কালাতীত, যুগাতীত, পরিস্থিতিনিরপেক্ষ যে শাশ্বত সত্য রহিয়াছে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে অভিনিবেশ দিয়া সেই বাণীকে বর্ত্তমান যুগে গ্রহণ করিতে হয়। জগতের কোনও যুগের কোনও মহাপুরুষই মিথ্যা নহেন, কিন্তু তোমাকে আমাকে আমাদের যুগের উপযোগী ভাবে তাঁহাদের অবদানকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। গুণগ্রাহিতার এই বিশেষ ভঙ্গীটী যাহার মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই, প্রাচীন কালের সত্যদর্শীদের উপদেশ-বাণী অধ্যয়নের ফলে তাহারা ভাল ভাল "থিসিস" হয় ত' লিখিতে পারিবেন কিন্তু নিজেদের ভিতরের সম্পদ বাড়াইবার ব্যাপারে তাঁহারা দারুণ অসাফল্য অর্জ্জন করিবেন। এই ভুল তোমরা কেহ করিও না। প্রেমসহকারে সকলের কথা শুনিও, প্রেমসহকারে সকলের ঈশ্বর-সাধনের নানা বিচিত্র প্রণালীগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতে ও পথে অটল থাকিও।

প্রেমাঞ্জন ও অনিল আহারে বসিয়াছে। এই ফাঁকে পত্রখানা

লিখিলাম। একটু পরেই পথশ্রান্ত শরীরকে নিদ্রায় দিব রজনীর বিশ্রাম। পরদিন চল ধানবাদ তথা পুপুন্‌কী।

আমি নিয়ত তোমাদের প্রতিজনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তোমরা আমার পরম আদরের সামগ্রী। তোমরা অসাধারণ শক্তি অর্জ্জন কর, ইহা আমি চাহি। শক্তি ও ভক্তি দুইটী তোমাদের যুগপৎ বর্দ্ধিত হউক। জগতের বুকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা হারাইয়া কেবল নিঃস্ব-নিঃসহায়ের ভক্তি লইয়া তোমরা চল, ইহা আমি চাহি না। ঈশ্বর-ভক্তিতে তোমরা অপরাজেয় হও, সর্ব্বজীবপ্রেমে তোমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হও কিন্তু সবল মানুষের সরল মেরুদণ্ড লইয়া, প্রকৃত মানুষের আত্মমর্য্যাদা লইয়া, নিত্য-বিসংবাদী জগতের বুকে স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তোমরা মানুষের মত বিরাজ কর, মানুষের মত বিচরণ কর, ইহা আমি চাহি।

নিষ্প্রদীপের রাত্রি। চারিদিকে শুধু অন্ধকার। কাহারো কাহারো মনে আকাশ-পথে আকস্মিক বিমানাক্রমণের ক্ষীণ আশঙ্কা। তাহারও মধ্যে আমার প্রাণে একটী বিরাট প্রদীপ-শিখা জ্বলিতেছে,—আমরা প্রত্যেকে মানুষ হইব, কথায় ও কার্য্যে আমাদের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে, হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত চিত্তে সরল এবং কঠিন প্রতিটি কর্ত্তব্য আমরা পালন করিয়া যাইব, অপর মানুষের সঙ্কটকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপে কদাচ ব্যবহার করিব না, ভীরুতা, কাপুরুষতা, কর্ত্তব্য-





পরান্মুখতাকে সাধুতা বলিয়া লোককে ভাঁওতা দিব না। ধাপ্পাবাজির পথ আমরা চিরতরে পরিহার করিব, সোনাকে সোনাই বলিব, সীসাকে সীসাই বলিব।

শক্তি ও ভক্তির সমন্বয় না হইলে ইহা সুসাধ্য নহে। ইতি
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

**(২৫)**

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর
৩০শে ভাদ্র, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের স্বল্প কয়েকজনের ভিতরে ক্ষীণাকারে যে সৎসঙ্কল্প জাগিয়াছে, তোমাদেরই নিষ্ঠার শক্তিতে তাহা বিশ্বব্যাপক হইবে। এই বিশ্বাস রাখিও। তোমার সতীর্থগণের মধ্যে যাহাদিগকে উদাসীন দেখিতেছ, তাহাদের সম্পর্কে মোটেই হতাশ হইও না। একদা তাহাদের, প্রতিজনের না হউক, অধিকাংশের মন কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিবে। তাহাদের কর্ণে কর্ত্তব্যের ডাক পৌছাইতে কদাচ আলস্য করিও না। যাহারা নিজেদিগকে তোমাদের সতীর্থ বলিয়া পরিচিত করে না, এমন লোকেরাও যে দলে দলে একদা তোমাদের হাতে হাত, তোমাদের কাঁধে




COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

কাঁধ মিলাইবে, এই বিশ্বাসও অন্তরে পোষণ করিতে থাক এবং তদনুযায়ী ক্ষেত্র-নির্ম্মাণে, ক্ষেত্রোৎকর্ষ-সাধনে, ক্ষেত্র-পরিধি-বর্দ্ধনে মনোযোগী হও।

সংগঠন একটা শক্তি এবং তাহার মূল উৎস প্রেম। প্রেমহীন সংগঠন চালবাজিতে পরিণত হয়, লোক-প্রতারণার রূপ পায়। প্রেমাশ্রিত সংগঠন সংগঠক কর্ম্মীকে আত্মাহুতি-মহানন্দে নৃত্যপর করে। তোমরা প্রেমিক হও, অদোষদর্শী হও, গুণগ্রাহী হও এবং অবারিত বিক্রমে নির্ব্বিচারে সর্ব্বজাতির সর্ব্বসম্প্রদায়ের মানবগোষ্ঠী সমূহের নিকটে তোমাদের অভ্যুন্নত আদর্শের আবেদন লইয়া উপস্থিত হও। তোমাদের প্রেম যদি খাঁটি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংবেদনশীল এবং বিক্ষোভ-পরায়ণ—এই দ্বিবিধ মানুষেরাই তোমাদের সহিত সাগ্রহে সানন্দে মহাসমাদরে এক সময়ে না এক সময়ে নিশ্চিতই মিলিত হইবেন। প্রেমকে অকৃত্রিম, ভানহীন ও ভেজালবর্জ্জিত রাখিবার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখ।

উপস্থিত বিপদ, আপদ ও অশান্তির মধ্যে আছ। আশীর্ব্বাদ করি, সকল বিঘ্ন ও বিপত্তি, সকল সন্তাপ ও অশান্তি তোমার অচিরে দূর হউক। ভগবানের পরমমঙ্গলাবহ নামে মনকে ডুবাইয়া দাও। নামের শক্তিতে সকল দুর্দ্দৈব দূর হইবে। ইতি—
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ





(২৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
৩রা আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইবার মরণজয়ী সঙ্কল্প করিয়া তোমরা কেহ কেহ আমার এত প্রিয় হইয়াছ যে, তোমাদের জীবনের শুভ্র সুন্দরতার কথা ভাবিতে আমি অন্তরে আবেশ অনুভব করি। প্রবল আবেগ এবং গভীর স্নেহ সহকারে আমি নিয়ত তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া থাকি। তোমরা শুধু একটা আদর্শই নহ, তোমরা একটা দিক্‌দর্শন। আদর্শে কেহ পৌছে, কেহ পৌছে না। অনেকের নিকটে আদর্শ এক পরমরমণীয় শ্লাঘা, কিন্তু প্রাপ্তি হইতে অনেক দূরে। দিগ্‌দর্শন প্রাপ্তির পথের পরিচালক। তোমাদের মত ছেলে-মেয়ের সংখ্যা আমার অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হউক, ইহা আমি নিয়ত কামনা করি।

ভোগসামর্থ্য আছে কিন্তু স্বকীয় মনোবলের মহিমায় দম্পতী অনাঘ্রাত কুসুমসম কেবল দেবপূজারই সামগ্রী হইয়া রহিল, ইহা কত বড় কথা। আগে মানুষ এত বড় কথা ভাবিতে সাহসই পাইত না। মনে করিত, কেবল অসাধারণ যুগপাবন পুরুষ ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা অসাধ্য। তোমরা জনে জনে প্রমাণিত করিতেছ যে, ইহা মলয়মারুতের সাবলীলতার ন্যায় একান্তই

স্বাভাবিক। তোমরা শুধু আমারই গৌরবের সামগ্রী নহ, তোমরা দেশের সম্পদ, জাতির বল। তোমাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক, এই প্রার্থনা আমি বারংবার করি।

তোমাদের ছোট্ট গ্রামটীতে আমি মানুষের মনে যথেষ্ট আবেগ লক্ষ্য করিলাম। এই মহাবস্তুকে যদি অনুকূল পথে পরিচালিত করা যায়, তাহা হইলে জগতে মহনীয় সৎকীর্ত্তি স্থাপন করা যায়। আবেগ মনের চঞ্চলতা কিন্তু নদীর জলস্রোতও কি চঞ্চল নহে? উচ্ছল তারল্যে সে বহিয়া যায়, দিকে দিকে পলিমাটির পরম সম্পদ বিলাইতে বিলাইতে। নদীর মুখে যখন যোগ্য বাঁধ পড়ে, তখন সে বসুন্ধরাকে করে শস্যদা। তোমাদের গ্রামের প্রত্যেকটী আবেগবান পুরুষ-নারীকে তোমরা সৎ-কীর্ত্তিমান পুরুষ-নারীতে পরিণত করিতে প্রয়াসী হও বাবা।

আমার আদর্শকে প্রচার কর কিন্তু আমাকে ধ্যান করিতে কাহাকেও উপদেশ দিও না। আমাকে ধ্যান করা যাহার প্রয়োজন, আমি নিজেই গিয়া তাহার ধ্যানের মানসে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিব, কষ্টকল্পনা করিয়া আমার মূর্ত্তিকে ভাবনা করিতে হইবে না। আমার নিদেশ-নির্দ্দেশ যে পাইয়াছে, সে আমাকে নিত্য-সঙ্গী, নিত্য-সাথী নিয়ত-নিকট রূপে জানিয়াছে। আমাকে আলাদা করিয়া ধ্যান করিবার প্রয়োজন তাহার নাই। একদা সে আমার সহিত অভেদ-অভিন্ন হইবে, হয় নিজেতে আমাকে মিশাইয়া ফেলিবে, নয় আমাতে নিজেকে ডুবাইয়া





দিবে। সাধন যদি করিয়া যাও, অখণ্ডের ইহাই উপলব্ধি। আমাকে পূজিয়া নহে, আমার সহিত অদ্বয় সত্তা হইয়া গিয়া সে আমার আপন হইবে, সে আমাকে আপন করিবে।

এটা অবতার-বাদের দেশ, তাই তোমরা মহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে ভালবাস। তোমাদের পূজা করিবার অনির্ব্বচনীয় ও বিচিত্র প্রবণতা তোমাদের দ্বারা নিত্য নূতন অবতার সৃষ্টি করাইতেছে। তোমরা পূজা করিতে ভালবাস বলিয়া কত অযোগ্য অধম ব্যক্তিরাও অবতারের গদীতে আসীন হইয়া উৎকট সমারোহে সহস্র সহস্র সরলচেতা নরনারীর চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিতেছে। কিন্তু যাহাদিগকে অবতার বলিয়া মানিতেছ, তাহাদের সহিত মনে প্রাণে মিলিত হইয়া তোমাদের অন্তরে পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণশক্তির দেদীপ্যমান উপস্থিতির আস্বাদন মিলিতে পারে। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" কথাটার মানে এই নহে যে, বুদ্ধপূজা করিয়া কৃতার্থ হইব, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধ-ভাবনায় নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া নিজে সম্যক্-সম্বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্ব লাভ করিব। সাধারণ হিন্দুরা যে ভাবে রাম বা কৃষ্ণকে দেখে, বৌদ্ধরা বুদ্ধকে সেই দৃষ্টিতে দেখে নাই। একদল যে সময়ে রাম বা কৃষ্ণকে পূজা করিয়াই খালাস, অন্য দল সেই সময়ে বুদ্ধত্ব অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত থামিবে না। এই দুই দলের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ?

আমি নিজ পূজার প্রবর্ত্তন করিতে চাহি না, আমাকে পূজা

করিবার জন্য একটা হিড়িক পড়িয়া যাউক, ইহা কামনা করি না। কিন্তু একদল লোক স্বরূপানন্দ-ভাবনায় নিশ্চিতই আনন্দ লাভ করিবে। তাহাদের প্রাপ্তি পূজা-জনিত আত্মপ্রসাদই নহে, তাহাদের লভ্য স্বরূপের আনন্দকে নিজের পূর্ণ অস্তিত্বের সহিত অভেদ রূপে প্রাপ্ত হওয়া। পূজা আর ধ্যান এক বস্তু নহে কিন্তু পূজায় ধ্যান আসে। ধ্যান আর পূজাও এক কথা নহে কিন্তু ধ্যানেও পূজা আসে। সেই পূজাই প্রকৃত পূজা, সেই ধ্যানই সার্থক ধ্যান, যাহা পূজিতের সহিত পূজককে, ধ্যাতার সহিত ধ্যায়িতকে এক করিয়া দেয়।

ভেদ-বিচ্ছেদ রহিবে না কিছু আর,
সাধন-তত্ত্বে ইহাই চমৎকার।

ইতি— ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**(২৭)**

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

৫ই আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা— এবং স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুন্‌কীতে সংবাদপত্র পাওয়া দুরূহ ব্যাপার, র্যাডিও ত' 





নাই-ই। তাই যুদ্ধের খবর কিছুই জানি না। তবে, নানা স্থানের পত্রাদি হইতে তোমাদের অবস্থা অনুধাবন করিতেছি।

কোনও অবস্থাতেই তোমরা মনের বল হারাইও না। ঈশ্বরের নামে নির্ভর কর, মনুষ্যজাতির সর্ব্বজনীন কুশলে বিশ্বাস কর এবং সাহস সহকারে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও। মনকে ক্ষণকালের জন্যও ব্যস্ত, বিব্রত, বিমর্ষ বা উদ্বিগ্ন হইতে দিও না।

তোমরা তোমাদের অখণ্ড-সংহিতা পাঠের প্রকল্প চালাইয়া যাও। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্ব-কলহ, সামাজিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক আলোড়ন এবং অন্যান্য নানাপ্রকার চিত্ত-বিক্ষেপকর ঘটনাবলী সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের আসল কাজ চালাইয়া যাইতেই থাকিবে। এই জন্যই আমি নিজেকে কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত করি নাই। পুরুষানুক্রমে তোমরা একটী মহা-মহীয়ান্ আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়া যাইতে থাকিবে। লক্ষ্য তোমাদের সদূর। চেষ্টা তোমাদের হইবে পুরুষানুক্রমিক এবং ধারাবাহিক। তোমাদের চেষ্টার ধারাবাহিকতা যেন কদাচ ক্ষুণ্ণ না হয়। ইতি ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(২৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৬ই আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ৩১ ভাদ্রের পত্র পাইলাম। তোমাদের ওখানে আকাশ হইতে গোলাগুলি বর্ষণ হইয়াছে সংবাদে চিন্তিত হইলাম। তবে ইহাতে ভীত হইলে চলিবে না। তোমাদের কর্ত্তব্য শাশ্বত, তোমাদের ব্রত সনাতন, তোমাদের লক্ষ্য সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানবের কুশল। তোমরা নানারূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও মন ও মাথা ঠিক রাখিয়া নিজেদের কাজ নির্ভীক ভাবে করিয়া যাও।

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে মানুষ সহস্র বিপদেও ঘাবড়াইয়া যায় না। বিপদের অতীতে থাকিয়া নিরাপদে কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইবার চেষ্টা তার থাকে কিন্তু বিপদ দেখিলে তাহার বুদ্ধি-বিলোপ হয় না। তোমরা তোমাদের সমগ্র ধীশক্তিকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার কাছ হইতে নির্ভীক প্রজ্ঞা আহরণ করিয়া লও।

ঈশ্বরের নামে মন থাকিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হয়। নামসেবা বিশ্বাসের দৃঢ়তা বাড়ায়। আবার, বিশ্বাসের গভীরতা নামসেবার রুচি বাড়ায়। তোমরা নামানন্দী রুচিমান হও।





স্বল্প সময়ের জন্য পুপুন্‌কী আসিয়াছি। শরীর কর্ম্মক্ষম নহে। তবু কাজ করিতেছি। শুধু ভরসা, তোমরা যাহারা জীবনের কাজ চিনিলে না, জীবনের পথ জানিলে না, জীবনের আদর্শকে বুঝিলে না, জীবনের কর্ত্তব্যকে সাদরে সানন্দে স্বীকার করিয়া নিলে না, তাহাদের দিব্য রূপান্তর একদা নিশ্চিতই আসিবে। আমার আজিকার শ্রম সেদিন সাফল্যের ও সার্থকতার কনক-কিরীট শিরে ধারণ করিবে। ইতি ২৩শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৬৫

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(২৯)

হরিওঁ

রাঁচি ও পুপুন্‌কী

৮ই আশ্বিন, ১৩৭২

২৫-০৯-৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কাল সকালে পুপুন্‌কী হইতে রাঁচি রওনা হইবার সময়ে পত্রখানা হস্তগত হইল। এখানে স্বল্প সময় থাকিব। আর ঘণ্টা দুই পরে পুনঃ পুপুন্‌কী রওনা হইব। তবু পত্র লিখিবার অবসর করিয়া লইলাম। মোটর-কারে লটবহর বাঁধা হইতেছে। যতক্ষণ উহা শেষ না হয়, ততক্ষণ

লিখিয়া যাইব। পুপুন্‌কী থাকিলে এতগুলি প্রশ্নসম্বলিত পত্রের জবাবে হাত দিতে পারিতাম কিনা, সন্দেহস্থল। পুপুন্‌কীতে বড় কাজের ভিড়। সেখানে নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া থাকিতে হয়।

কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক, তুমি বড় হইবে, মহৎ হইবে, মানুষের মত মানুষ হইবে। তোমার সৎসঙ্কল্প যত গভীর হইবে, তোমার ভ্রম-প্রমাদ তত কমিতে থাকিবে। "কামুক হইব না, লম্পট হইব না, কুকার্য্য করিব না",—এইরূপ নেতিবাচক সঙ্কল্পে কামকে বা কুপ্রবৃত্তিকে সকল সময়ে দমন করা যায় না। কিন্তু "আমি" মহৎ হইব, আদর্শ মানব হইব, লোকোত্তরচরিত পুরুষ হইব",—এই জাতীয় ইতি-বাচক সঙ্কল্প করিতে থাকিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ড প্লাবন দেহ-মনের পরতে পরতে নবশক্তির, নবসৃষ্টির, নবায়নের লীলাখেলা চালাইতে থাকে,—যাহার ফলে দীর্ঘকালের সঞ্চিত পাপের আগ্রহ, অনেক দিনের অর্জ্জিত হীন অভ্যাস, বহু বৎসরের অনুশীলিত ঘৃণ্য রুচি নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে অথবা সহসা দূরে পলায়ন করে। অন্তরের উচ্চাভিলাষকে কেবল বাড়াইতে থাক। ইহার শুভফল অকল্পনীয়।

পরমেশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কেহ কোনও কাজ করিতে পারে না, ইহা যেমন সত্য, মানুষকে তিনি বহু কাজ করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন, ইহাও তেমন সত্য। যে ক্ষেত্রে তিনি তোমাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে তুমি মন্দ জানিয়াও কুকাজ করিবে





আর এ কাজের জন্য পরমেশ্বরকে দায়ী করিবে, ইহা সুযুক্তি নহে,—ইহা চালাকী। মন্দ বলিয়া যাহা বুঝিলে, তাহাকে বর্জ্জন করিবার স্বাধীনতা তোমার আছে। তুমি সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার না করিয়া সুখলোভে স্বার্থলোভে লাভলোভে মন্দ কাজই করিলে এবং তারপরে বলিয়া বসিলে, "ইহা ভগবানই করাইয়াছেন, ভগবানেরই সব দায়িত্ব, আমি কেন দোষভাক্ হইব",—ইহা অন্যায়। তাঁহার হাতের যন্ত্ররূপেই যদি তুমি নিষ্কাম ও দায়িত্বহীন ভাবে আগুনে হাত দিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার হাতের যন্ত্ররূপেই তোমাকে নিষ্কাম ও দায়িত্বহীন ভাবে আগুনে পুড়িতে হইবে। যখন তিনিই তোমাকে দিয়া কাজ করাইতে থাকিবেন তখন তিনিই কর্ম্মের ফল বা কুকর্ম্মের দাহন হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন। কুকর্ম্ম করিব আমি, আর ফলভোগের বেলা বলিব, "ঠাকুর, ঠাকুর, এই বিষটুকু তুমি গলাধঃকরণ কর", ইহা কেমন কথা? কর্ম্ম যখন তিনিই করেন, তখন ফলভোগের দায়িত্ব বা ফলের বিষজ্বালা হইতে তিনিই রক্ষা করিবেন। কর্ম্ম যখন তুমি করিবে, তখন কর্ম্মের ফল গ্রহণের জন্য তোমাকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কাজ করিবার সময়ে তাঁহাকে মনে রাখিব না, ফল ভুগিবার সময়েই কেবল তাঁহাকে গালি পাড়িব, ভদ্রতা মন্দ নয়। তবে, ইহার ভিতরেও আমাদের এতটুকু লাভ আছে যে, পরবর্ত্তী কালে কোনও কাজে হাত দিবার সময়ে তাঁহার কথা মনে পড়িতেও

পারে। তিনিই যে সর্ব্বেশ্বর, তিনিই যে কর্ত্তা, আমি যে উপলক্ষ্য বা হস্তধৃত যন্ত্র মাত্র, আমার ব্যক্তিত্ব যে কেবল তাঁহার হাতে নিজেকে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যেই সার্থক, এই কথা তখন মনে জাগিতে পারে। আর, ইহা যদি জাগে, তাহা হইলে, যাহাতে কুশল, তাহা ছাড়া অন্য কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। স্বাধীন ইচ্ছা এবং প্রাক্তন নির্দ্ধারণ এই দুইটী বিষয় নিয়া দার্শনিকদের মধ্যে অশেষ কলহ আছে। কিন্তু সাধকদের জীবনে এই দুইটীর সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। স্বাধীন ইচ্ছা তিনিই দিয়াছেন আর এই স্বাধীন ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত করিবার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তবে তাঁহার ইচ্ছা যে কি, তাহা জানিতে হইলে আগে তাঁহাকে জানিতে হয়। তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার সাধন করিতে হয়। সাধনের ইহাই লক্ষ্য, তাঁহাকে জানারও ইহাই ফল। ঈশ্বরানুগত জীবন, জাগ্রত বিবেকে ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুসরণ, নিজেকে স্বাধীন জানিয়াও ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী করিয়া পরিচালন, ঈশ্বরাভিপ্রায়ানুসারে চলিতে চলিতে নিজেকে তাঁহার মধ্যে সমগ্রতঃ এবং সম্যগ্‌ভাবে পরিনিমজ্জন। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা অব্যক্ত এবং অনির্ব্বচনীয় কিন্তু অনুভবনীয়, আস্বাদনীয়,—সে আস্বাদন মুকাস্বাদনবৎ।

সাধন করিতে হইলে মনঃসংযমনের কেন্দ্রবিন্দু চাই। তাহাকেই প্রতীক বলে। কেহ দেওয়ালে একটী বিন্দু আঁকিয়া প্রতীকের প্রয়োজন পূরাণ। কেহ আকাশের একটী নক্ষত্রকে





লক্ষ্য করেন। কেহ ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্যোতিকে অবলম্বন করেন। কেহ ঘটে, কেহ পটে চিহ্ন-বিশেষ দিয়া তাহাতে সর্ব্বশক্তিমানের দিব্য বিরাজমানতাকে আরোপিত করেন। এভাবে নানা জনে নানা প্রতীকের আশ্রয় নেন। প্রতীক মনঃসংযমের সহায়ক, প্রতীক অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রসারক, প্রতীক অবলম্বনহীন মনকে ধরিয়া রাখিবার যন্ত্র। যেরূপ প্রতীক গ্রহণ করিলে নানাভাবানুবিষ্ট সহস্র রকমের বিভিন্ন মন একটী স্থানে বসিতে নির্দ্বিধ হইবে, আমি আমার অনুবর্ত্তীদের জন্য সেইরূপ প্রতীকের ব্যবস্থা করিয়াছি। যাহাদের অন্য প্রতীকে রুচি, তাহাদিগকে আমি নিজ প্রতীকের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হইতে বলিতে পারি না। কিন্তু যাহারা আমার শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে, 'ওঙ্কার' প্রতীক ছাড়া তাহাদের আর কোন্ প্রতীক হইতে পারে? ওঙ্কার-বিগ্রহ ছাড়া তাহারা আর কোন্ বিগ্রহ বসাইবে?

বাঙ্গালীর ছেলেরা "ওঁ" এইরূপ বঙ্গাক্ষরীয় প্রতীক বসাইতেছে। ইংরাজের ছেলে কি "OM" অথবা "AUM" এইরূপ প্রতীক বসাইবে? তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া ভাষাভাষীরা কি নিজ নিজ লিখ্য অক্ষরে প্রতীক নির্ম্মাণ করিবে? করিলে দোষ নাই, কারণ প্রত্যেক স্থলেই উদ্দেশ্য এক। চিত্রিত প্রতীক একটী নির্দ্দিষ্ট ধ্বনিই স্মরণ করাইয়া দিবে। এই ধ্বনিটির আক্ষরিক রূপ যে-ভাবেই অঙ্কিত হইয়া থাকুক, উচ্চারণটী সর্ব্বত্রই এক। আবার, ঔষ্ঠিক উচ্চারণ বা মৌখিক ধ্বনি যাহাই

হউক, অনাহত মৌলিক নাদ যখন অনুভবে আসিবে, তখন সর্ব্ব-ভাষাভাষীর পক্ষেই এক হইবে। সুতরাং আক্ষরিক রূপ কেহ নিজ মাতৃভাষায় প্রচলিত অক্ষরের অনুযায়ী করিয়া লইলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু "ওঁ" এই বঙ্গাক্ষরীয় প্রতীকটীর যে নির্দ্দিষ্ট একটী উচ্চারণ আছে, তাহা স্মরণ রাখিতে, অবঙ্গভাষীর পক্ষে খুব একটা কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে, তাহাও নহে। সুতরাং বঙ্গাক্ষরীয় প্রতীককে বর্জ্জন করিবারও কোনও গুরুতর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় পুপুন্‌কী ফিরিয়াছি। তোমার বাকী প্রশ্নগুলির উত্তর নিম্নে দিতেছি।

মহাপুরুষদের জীবনী যাঁহারা লেখেন, তাঁহারা তাঁহাদের শ্রদ্ধার আস্পদ পুরুষগণের বাল্যজীবন লিখিবার কালে এমন অনেক কথা লিখিয়া থাকেন, যাহা দ্বারা এই সূচনাটুকু পাওয়া যায় যে, একদা ইঁহারা মহাপুরুষ হইবেন। কিন্তু জগতের কাহার বাল্যকালের কথা কে স্মরণ করিয়া বসিয়া আছে? তাঁহাদের দিগন্তব্যাপী যশঃসম্বর্দ্ধিত জীবন লাভের পরে হঠাৎ লেখকগণের এমন অনেক ঘটনার কথা মনে পড়িয়া যায়, যাহা, এই ব্যাক্তিটি যশস্বী না হইলে হয়ত মনেই পড়িত না। ইহা হইতে দুইটি ইঙ্গিত মিলে। এক, ভাবী কালে যাঁহারা মহাপুরষ বলিয়া পূজিত হন নাই, তাঁহাদেরও অনেকের বাল্য-জীবনে অনেক প্রশংসনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। দুই, ভাবী কালে যাঁহারা মহাপুরুষ হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের বাল্যজীবনে ঘটনার ঐশ্বর্য্য আসিয়াছিল।





অনেকে মহাপুরুষ হইতে পারিতেন কিন্তু হন নাই। অনেকে মহাপুরুষ নাও হইতে পারিতেন কিন্তু হইয়া গিয়াছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার যে, সাধন করিয়াই মানুষ সিদ্ধ হয়, সাধন না করিয়া নহে। সাধন-অসাধনের তারতম্য হেতু দুইটী শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই দ্বিবিধ রূপান্তর ঘটিতেছে। তোমাদের ইহাই বিশ্বাস করা ভাল যে, তোমাদের বাল্যকালেও এমন অনেক কিছু ঘটিয়াছে, যাহা তোমাদের স্মরণে নাই কিন্তু যাহা বাল্যে ঘটিলে এবং পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কার প্রভৃতি অনুকূল থাকিলে, তুমি মহাপুরুষ হইতে পারিতে। কেহ জন্মমাত্রই অশেষ সদ্‌গুণান্বিত হইয়া আসে, কেহ বোপদেবের মত দুর্ম্মেধা হইয়া আসিয়াও অধ্যবসায়-বলে মুগ্ধবোধের মত ব্যাকরণের রচয়িতা হন,—এই উভয়বিধ দৃষ্টান্তই জগতে আছে। একদল লোক ত্রিলোকোদ্ধার করিবার জন্য মহাপুরুষ হইয়াই অবতরণ করিবেন এবং তুমি আর আমি কেবল উঁহাদের করুণায় উদ্ধার পাইবার জন্য সাধারণ হইয়াই থাকিব, এতজ্জাতীয় চিন্তা ও বিচার মন হইতে দূর করিয়া দাও। প্রকৃত প্রস্তাবে কেহই ত্রিলোকোদ্ধার করিবার জন্য আবির্ভূত হন না। প্রত্যেকেই আত্মোদ্ধারের প্রয়াসে ব্রতী হন এবং আত্মোদ্ধারের পথে নামিয়া কেহ কেহ এমন উৎকর্ষ লাভ করেন, যাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, উপদেশে, অনুসরণে আরও শত শত জন আত্মোদ্ধারের সুবন্ধুর পথে অগ্রসর হইয়া যান। জগদুদ্ধারের জন্য কেহই আসেন না, নিজ নিজ আত্মোদ্ধার এবং আত্মপ্রকাশের পথে কেহ কেহ বহুজনকে

উদ্ধারের পথে টানিয়া আনেন। বহুজনকে উদ্ধার করিবার পরে তাঁহাদের সম্পর্কে আমরা প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করি,—"প্রভু হে, জগদুদ্ধারের জন্য তুমি আসিয়াছিলে, কেননা সাধুজনের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতিকারীর বিনাশ তুমি চিরকাল করিয়া আসিয়াছ, চিরকাল করিবে।" জীবন-চরিত লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, প্রত্যেক মহাপুরুষকে জীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য সাধন করিতে হইয়াছে। "লোকে দেখুক আমরাও সাধন করি"—এই প্রবৃত্তি হইতে ইঁহারা কেহই সুতীব্র সাধনে আত্মনিয়োগ করেন নাই।

এই দৃষ্টিতে মহাপুরুষদের আবির্ভাবকে দেখিলে তোমাকে আর আফশোষ করিতে হইবে না যে, একজন মহাপুরুষ বা অবতার-পুরুষ আবির্ভূত হইয়া যাইবার পরে আবার অন্য মহাপুরুষ বা অবতারগণের আবির্ভাবের প্রয়োজন কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৩০)

হরিওঁ

বারাণসী

১৮ই আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পূর্ব্ব-ভারতে প্রচলিত জনপ্রিয় হিন্দু পূজাপার্ব্বণগুলির মধ্যে দুর্গোৎসব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন হয়? কারণ, ঐ





একটী দুর্গাদেবীর অর্চ্চনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বুদ্ধির দেবতা গণেশ, বীর্য্যের দেবতা কার্ত্তিকেয়, জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী, ধনের দেবতা লক্ষ্মী আদি সকলের অর্চ্চনা করা হয়। একের উপলক্ষ্যে যেখানে বহুর অর্চ্চনা আপনা আপনি হইয়া যায়, সেখানে উৎসবকে কুলীনতম বলিয়া কেন গণনা করা হইবে না? দুর্গোৎসব যে পূর্ব্ব-ভারতে প্রচলিত সকল পূজোৎসব অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ ইহা।

কিন্তু তুমি দুর্গোৎসবের চাইতে বড় উৎসব এবার করিয়াছ। তুমি একটী মাত্র 'ওঙ্কার'-বিগ্রহের মধ্যে জগতের যাবতীয় দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া পূজার আসন হইতে অন্যান্য সকল দেবদেবীর বিগ্রহ সসম্ভ্রমে তুলিয়া নিয়া আমার হস্তে প্রদান করিয়াছ। তোমার লক্ষ্মী, তোমার সরস্বতী, তোমার শিবপার্ব্বতী, তোমার কার্ত্তিকগণেশ, তোমার কালী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, তোমার কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি সকলের স্থান ঐ একটী মাত্র বিগ্রহ অধিকার করিয়া সগৌরবে পূজার আসনে একমেবা-দ্বিতীয় হইয়া বসিয়াছেন। ইহার চেয়ে বড় উৎসব আর কিছুই হইতে পারে না। এই দৃঢ়তা, এই সঙ্কল্পবল, এই একনিষ্ঠা, এই স্বাধীনচিত্ততা তোমার মত একটী মেয়ের মধ্যে হঠাৎ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু কাহারও অনুরোধে পড়িয়া নহে, উপরোধে পড়িয়া নহে, উপদেশ দ্বারা পরিচালিত হইয়া নহে, কাহারও প্রচারণার ফলে প্রভাবিত হইয়া নহে, নিজের স্বাধীন

বিবেক-বুদ্ধিতে তুমি যে একনিষ্ঠার সঙ্কল্পে সমারূঢ় হইয়াছ, ইহা অসম্ভব ব্যাপার না হইলেও, আশ্চর্য্য ব্যাপার। গয়া হইতে পুপুন্‌কী যাইবার কালে তোমার অন্তরের এই প্রবল একনিষ্ঠার একটা সুন্দর প্রমাণ পাইয়াছিলাম। গয়া হইতে বারাণসী আসিবার কালে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাইয়া মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়াছি। একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহে মন বসাইয়া তুমি জগতে সকল লোভনীয় সম্পদের অধিকারিণী হইবে। কাহারও কথাতেই তুমি নিজের মনকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া তোমার গৃহীত পথ হইতে পশ্চাদপসরণ করিও না।

একটা মজার কথা শুনিবে? বর্দ্ধমান জেলার কোন এক স্থানে আমার একটী অখণ্ড সন্তান বাস করে। পুত্রের জীবনে উন্নতির রেখাপাত সুরু হইয়াছে দেখিয়া তাহার প্রাচীনপন্থী মাতা তাহার গৃহে এবার দুর্গোৎসব করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কার্য্যত কি হইয়াছে, তাহার খবর পাই নাই কিন্তু এই অভিলাষের কথা শুনিয়া আমার মনে পড়িয়া গেল তাহাদিগকে, যাহারা দীর্ঘকালের অনুষ্ঠিত বাৎসরিক দুর্গোৎসবকে অনায়াসে সর্ব্বসম্প্রদায়ের আনন্দদায়ক শারদীয় অখণ্ডোৎসবে পরিণত করিতে পারিয়াছে। তিনসুকিয়ার ডাক্তার সুরেন্দ্র ভাওয়ালকে কদাচ কেহ কোনও আদেশ বা নির্দ্দেশ প্রদান করে নাই কিন্তু একমাত্র ওঙ্কার-সেবার মধ্য দিয়া যে বিশ্বদেবতার সেবা হইয়া যায়, নিজ বিবেকের প্রবোধনে তাহা উপলব্ধি করিয়া এই প্রাতঃস্মরণীয় বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি এক দিনে সকল





পূর্ব্ব-সংস্কারের পরিবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বের সকলকে লইয়া শারদীয় অখণ্ডোৎসবে মাতিয়া গেল। কুমিল্লান্তর্গত কাশীপুরের হরিদাস দে পিতৃপুরুষের প্রথাগত দুর্গোৎসবকে একটী নিমেষে শারদীয় অখণ্ডোৎসবে পরিণত করিল। আজ সে পূর্ব্ববঙ্গে নাই, ত্রিপুরার রাজধরনগরে আসিয়াছে, কিন্তু এখানে আসিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে লইয়া প্রণব-বিগ্রহকে পূজামঞ্চে বসাইয়া পাঁচদিন ব্যাপী অখণ্ডোৎসবই করিতেছে। এই সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তির নিষ্ঠা আমার কোনও উপদেশের ফল নহে, ইহাদেরই সাধন করিয়া যাইবার ফল। তুমিও যে একটী নিমেষে তোমার ঠাকুরঘর হইতে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি অপসারণ করিয়া একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহকেই স্থায়ী করিতে পারিলে, ইহার মধ্যে তোমার সাধন-নিষ্ঠার পরিচয় আছে। সাধনে যাহার নিষ্ঠা আছে, জগতে কাহারও সম্পর্কেই তাহার কোনও ভয় নাই। সাধন-নিষ্ঠা অভয়ের জননী। সমাজের পাঁচজনে কি বলিবে, ইহাও যেমন নিষ্ঠাশীল সাধক গ্রাহ্য করে না, প্রথাগত সংস্কারে কোথায় বাধিবে, তাহাও তেমন সে চিন্তা করে না।

তুমি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছ, সেই সাহস তোমার অটুট থাকুক। নিরন্তর নাম কর, নামের সেবার মধ্য দিয়া শক্তি লাভ কর, সেই শক্তিকে পুনরায় তোমার নামে নিষ্ঠা বর্দ্ধনে প্রয়োগ কর। যাহা করিয়াছ, ঠিকই করিয়াছ, ভুল কিছুই কর নাই। তোমার এই আচরণের সকল দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।

কে কি আসিয়া কহিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য মাত্রও দিও না। অপরের মতে তোমার কার্য্যটী প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় হইল, ইহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিও না।

পুত্রকন্যাগুলির ভিতরে তোমার এই অটুট নিষ্ঠা সঞ্চারিত কর। তোমার স্বামীকে সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার অন্তরের সাথী করিয়া লও। তোমার বল তাহাকে, তাহার বল তোমাকে নিয়ত দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিতে থাকুক। সাধন-কর্ম্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্ম্ম, নিজস্ব দায়িত্বের কর্ম্ম। তোমাদের সাধন-কর্ম্মের মাঝখানে বাহিরের লোককে দন্তস্ফুট করিতে দিও না। ইতি
৫ই অক্টোবর, মঙ্গলবার, ১৯৬৫

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

## (৩১)

হরিওঁ বারাণসী
বুধবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭২
(৬-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই সঙ্গে একখানা পত্র পাঠাইলাম। পত্রলেখক প্রতিধ্বনি পড়িয়া সমবেত উপাসনার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছেন কিন্তু কি ভাবে উপাসনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তুমি অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর





এবং দুই একটী উল্লেখযোগ্য সমবেত উপাসনার আসরে তাঁহাকে নিয়া যাও। উপযুক্ত ব্যক্তিদের কণ্ঠনিঃসৃত উদাত্ত ধ্বনি শুনিতে পাইলে ইনি যাবজ্জীবনের জন্য সমবেত উপাসনার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাশীল হইবেন, এইরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

সমবেত উপাসনা মানুষের মনকে একাধারে ঐহিক জীবনের মিলনাকাঙ্ক্ষায় এবং আত্মিক জীবনের গভীর উৎকর্ষের দিকে টানিয়া নেয়। সমবেত উপাসনার এই বিশেষত্বের দরুণ ইহা অনৈক্য-পীড়িতদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সংস্থাপক এক অদ্বিতীয় উপায়। উপরন্তু ইহা আত্মিক উৎকর্ষের সহায়িকা বলিয়া সাধককে অনেক জঞ্জাল হইতে নিজগুণেই রক্ষা করে।

এমন বস্তুর প্রতি লোকের অন্তরের স্বাভাবিক সমাদর জাগ্রত হইলে তেমন সজ্জনদিগকে তোমরা কদাচ দূরে দূরে থাকিতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

## (৩২)

হরিওঁ বারাণসী
শুক্রবার, ২১শে আশ্বিন, ১৩৭২
৮-১০-৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদে বড়ই শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু যেখানে এক ভ্রাতার প্রতি অপর ভ্রাতার মানবিক বিবেচনার অভাব, সেখানে মিলিয়া মিশিয়া থাকাও শক্ত। আমার পিতৃদেব বলিতেন,—"নিত্যকলহ মহাযুদ্ধ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।" সুতরাং নিত্যকলহ এড়াইবার জন্য যাহা করণীয়, নিঃসঙ্কোচে করিও।

কর্ত্তব্যের দায়ে কাহারও প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া তাহার প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ পোষণ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। নির্ব্বিদ্বেষ হইয়া যেই ব্যক্তি কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে, সে-ই প্রকৃত কর্ম্মী। অন্তরের প্রেম-সম্ভার দিনের পর দিন বাড়াইবার চেষ্টা কর। এই প্রেম কেবল তোমার হিতের, তোমার লাভের, তোমার শান্তির জন্যই নহে, ইহা দ্বারা বিশ্বের প্রতিজনের হিত হউক, প্রতিজনের লাভ হউক, প্রতিজনের শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি এবং আত্মপ্রসাদ ঘটুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

শনিবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৭২
(৯-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।





শ্রীশ্রীউপাসনা-প্রণালী বহিখানা মাঝে মাঝে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে ভুলিয়া যাও কেন? তাহাতে কি লেখা নাই যে,—

> "(১৮) সমবেত উপাসনা যাহারই গৃহে হউক, প্রত্যেক যোগদানকারী কর্ত্তৃক সম্ভবমত নিজ নিজ পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, দুর্ব্বাদল, শ্বেতচন্দনঘষা ও নৈবেদ্য নিয়া যাওয়া, এবং কায়মনোবাক্যে সহযোগ করা এবং খালি হাতে না যাওয়া (১৯) যে-কোনও স্থানে সমবেত উপাসনা হউক, সমাজ- সন্নীতি-বিরোধী গুরুতর কারণ না থাকিলে, নিমন্ত্রিত না হইলেও তাহাতে যোগদান করা।"

তোমাদের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য?

সমবেত উপাসনাতে কেহ যোগদান করিতে অনুরোধ করিলে কেন তোমরা প্রশ্ন কর যে, গৃহকর্ত্তা নিজে কেন তোমাদের ডাকেন নাই? যাহাকে গৃহকর্ত্তা মনে করিতেছ, তিনি নিজে আসিয়া অনুরোধ করিলে কেন বল যে, ইনি অখণ্ড নহেন, অতএব যাইবে না? কেহ যদি বুঝাইয়া দেয় যে, গৃহকর্ত্তা বলিতে যাঁহাকে বুঝিতেছ, তিনি অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত না হইলেও, তাঁহার পুত্রকন্যারা অখণ্ড, তাহা হইলে ঐ গৃহে উপাসনায় যাইবার জন্য অন্য ছল, অন্য ছুতা আবিষ্কারে কেন চেষ্টিত হও? তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমাদের এই জাতীয় আচরণ লজ্জাকর ও কলঙ্কজনক? এতদিন এত

প্রকারের সদনুষ্ঠান করিয়া তোমরা বিবেকের যে স্বচ্ছতা অর্জ্জন করিয়াছিলে এবং জন-সমাজের কাছে যে বিপুল শ্রদ্ধার আস্পদ হইয়াছিলে, ঐ দুইটী সম্পদই যে এই সকল হীনবুদ্ধি-প্রসূত আচরণের দ্বারা খোয়াইতে বসিয়াছ, তাহা কি তোমাদের হিসাবে এখনো ধরা পড়ে নাই? কয়েকটা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিয়া তোমাদের যদি এমন দর্পান্ধতা জন্মিয়া থাকে যে, কেহ অখণ্ড নহে বলিয়া তাহার গৃহে সমবেত উপাসনায় তোমরা যাইবে না, তবে তোমাদের প্রতি আমার নির্দ্দেশ এই যে, তোমরা যে আমার শিষ্য, এই পরিচয়টুকু অদ্য হইতে দেওয়া বন্ধ কর। তিনসুকিয়া, আগরতলা, টাটানগরের ছেলে-মেয়েরা অনখণ্ডের বাড়ীতে সমবেত উপাসনার সংবাদ পাইলে সকল কাজ ফেলিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়, আর তোমাদিগকে অনুরোধ করিতে আসিলে তোমরা অনখণ্ড বলিয়া তার বাড়ীতে যাইতে আপত্তি কর। বিচার করিয়া দেখ, অনেক প্রশংসনীয় কীর্ত্তি অর্জ্জনের পরে আজ তোমরা উন্নতির পথে চলিয়াছ, না, জাহান্নমে নামিতেছ।

কাহারও বাড়ীতে সমবেত উপাসনা করিতে হইলে মণ্ডলীর অনুমতি পূর্ব্বে লইতে হইবে, এইরূপ একটা গুঞ্জন কোথাও কোথাও আছে। কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, একই দিনে দুই তিন স্থানে সমবেত উপাসনা থাকিলে, যোগদানেচ্ছুরা প্রত্যেকে এক সঙ্গে প্রতি স্থানে যাইতে পারে না। এজন্য ডিব্রুগড়ে ১লা বৈশাখের উপাসনা দ্বারা যাহারা হালখাতা করে,





তাহারা প্রাতঃকাল হইতে সুরু করিয়া এক এক স্থানে পর পর উপাসনার সময় সাজাইয়া যায় এবং ইহার ফলে উপাসনায় অনুরাগী প্রায় প্রত্যেকে অধিকাংশ স্থানে গিয়া ঠিক সময় মত মিলিত হইতে পারে। কিন্তু ১লা বৈশাখ ছুটীর দিন। সেদিন ইহা চলে। অন্য দিন একই তারিখে বহুস্থানে সমবেত উপাসনা হইতে গেলে সর্ব্বত্রই জনসংখ্যা আশানুরূপ হইতে পারে না। এজন্য, এমন একটা স্থান থাকা দরকার, যেখানে সকলের মনোবাসনা নিবেদিত হইলে অনেকের পক্ষে যোগদানের সুবিধাজনক দিনটী এক এক জনকে বলিয়া দেওয়া যায়। মণ্ডলীতে খবর দিবার তাৎপর্য্য এই। কিন্তু এই কথার অর্থ এই নহে যে, মণ্ডলী আদেশ না দিলে কেহ নিজ গৃহে সমবেত উপাসনা দিতে পারিবে না।

এই সকল বিষয়ে নানা স্থানে নানা ভাবে নানা কথা বলিয়াছি। সেই সকল তোমরা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? তোমরা অনেক ভাল কাজ করিয়া যশস্বী হইয়াছ বলিয়া সমবেত উপাসনার সম্পর্কে আমার স্থায়ী নির্দ্দেশগুলি ভুলিয়া যাইবে এবং নিজ নিজ ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী-মাফিক যখন যাহা ইচ্ছা নূতন নূতন নিয়ম ও প্রথা সৃষ্টি করিবে, ইহা আমি হইতে দিতে পারি না। সমবেত উপাসনা আমার প্রাণ বলিয়াই আমি এই ব্যাপারে তোমাদের অজ্ঞতা, অবাধ্যতা বা যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে অক্ষম।

সমবেত উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রেমের বিস্তার, পরকে

আপন করা। তোমরা যদি সমবেত উপাসনাকে বিদ্বেষের চর্চ্চায় নিয়া ফেল এবং আপনকে পর করিবার উপায় রূপে গ্রহণ কর, তবে আমাকেই সর্ব্বাগ্রে তোমরা বর্জ্জন কর।

তোমাদের মধ্যে গুণবান্ পুরুষ-নারীর অন্ত নাই। বর্ত্তমানে একটী মাত্র সহরে সংখ্যায়ও তোমরা অনেক সংঘের নিকটে বিস্ময়ের বস্তু, কাহারও কাহারও কাছে ভীতির পাত্র। কিন্তু সমবেত উপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে না পারার দরুন তোমাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইতেছে, তোমরা অনেক ব্যাপারে নিজেদের কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতেছ, তোমাদের ভিতরে আত্মদোষানুসন্ধানের এবং আত্মত্রুটি সংশোধনের বিনয় হ্রাস পাইয়াছে, কোনও ব্যাপারে দৃষ্টিকটু শ্রুতিকটু অসুন্দর অশোভন কিছু ঘটিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারটুকু করিয়া ফেলিয়া নিজেদের বিবেককে মেঘমুক্ত করিবার চেষ্টার তোমাদের অভাব ঘটিয়াছে। ইহাই যদি আরও কিছুকাল চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমাকে বুঝিতে হইবে যে, তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের যে শুভফল একদা জগৎ আশা করিতেছিল, সেই শুভফল হইতে সকলকে বঞ্চিত হইতে হইবে। অতএব এখনো সাবধান হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ





(৩৪)

হরিওঁ বারাণসী

২৩শে আশ্বিন, ১৩৭২

১০-১০-৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ভগবানে ভালবাসা থাকিলে ভগবানের জগৎকে ভালবাসা যায়। সেই ভালবাসা নিয়া সেবাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে সেবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে পরমেশ্বরে অন্তরের সমস্ত ভাব, ভক্তি, ভালবাসা অর্পণ কর।

আশ্রমে আসিয়াই তোমাকে কাজ করিতে হইবে, সংসারে থাকিয়া তাহা করিতে পারিবে না, নিজেকে কদাচ এত দুর্ব্বলা মনে করিও না। সংসারের সহস্র দায়িত্বের মধ্য দিয়া বিশ্বনাথের বিশ্বকে সেবা দিবার দুঃসাহসও কম প্রশংসনীয় নহে।

অনেক আচার্য্যেরাই সংসার ছাড়িয়া মঠে বা তপোবনে আসিয়া পড়িবার জন্য অনুবর্ত্তীদিগকে প্রেরণা দিয়াছেন। কেহ কেহ সংসার-জীবনকে ঘৃণ্য ও কদর্য্য বলিয়াও মনে করিয়াছেন। আবার, কেহ কেহ সন্ন্যাসকে ভণ্ডামী, সংসার-ত্যাগকে কাপুরুষতা, সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। আমার মতামত এই দুইটী

শ্রেণী হইতেও দূরে। আমি সন্ন্যাস ও সংসার উভয়ের ভিতরেই ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়াছি। আবার সংসার অথবা সন্ন্যাস এই দুইটীর প্রত্যেকটীর ভিতরে অসামান্য পৌরুষ ও কৃতিত্ব দেখিয়াছি। এইজন্যই আমি সন্ন্যাসেরও নিন্দক নহি, সংসারী জীবনেরও দোষোদ্‌ঘাটনে উৎসাহী নহি। যাহার যতটুকু শক্তি, সে তাহা নিজ নিজ স্বাভাবিক পরিবেশেই প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধজয়ী হউক। আমার কামনা যুদ্ধজয়। এ জয় সংসারী হইয়া কেহ করিল, না, সন্ন্যাস নিয়া কেহ করিল, ইহা আমার নিকটে অপ্রাসঙ্গিক। যে জয়ী, সে-ই পূজ্য, সে-ই প্রশংসার্হ, সে-ই বন্দনীয় কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ।

উল্লিখিত কথাগুলির আলোকে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিও। আমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনের বা সাংসারিক পরিবেশের অথবা সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কোনটীরই কোনও খবর জানি না। এই কারণে কোনও নির্দ্দিষ্ট ধারার উপদেশ তোমাকে দিতে পারি না। নিজ রুচিপ্রকৃতি বুঝিয়া, বলাবল বিচার করিয়া, আত্ম-প্রসাদের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিয়া নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্য স্থির কর। তুমি হয়ত আমাকে কখনো দেখ নাই। আমিও তোমাকে দেখি নাই। তথাপি তুমি যে অত দূর হইতে আমার প্রতি তোমার অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছ। তাহা দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছি।





তোমার পত্রের প্রত্যেকটি অক্ষরে সংযম, শুচিতা, সুদৃঢ় চরিত্র-বলের ছাপ আছে। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনে কৃতকৃত্য হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

## (৩৫)

হরিওঁ বারাণসী
২৭শে আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেককে নিজ কর্ত্তব্যে অবহিত রাখিবে। একজনেও যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য না ভোলে। ছোট, বড় প্রতিজনকেই নিজ নিজ কাজে শ্রদ্ধাভরে, নিষ্ঠাসহকারে লাগিয়া থাকিতে হইবে। অসংখ্য পুরুষ ও নারী যেখানে একটী লক্ষ্যে স্থির, সেখানে অকল্পনীয় ঘটনাসমূহের সৃষ্টি হয়।

কর্ত্তব্য কি, ইহা চিনিয়া নেওয়া শক্ত। কিন্তু মন সাধনপরায়ণ হইলে চিত্ত-প্রশান্তির ভিতর দিয়া কর্ত্তব্যের মুখচ্ছবি স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া ওঠে। উদ্বিগ্ন, চঞ্চল মনকে সাধন করিয়া শান্ত কর, একাগ্র কর। কর্ত্তব্য চিনিতে দেরী হইবে না।

জীবনে তোমার দুঃখ আসিয়াছে। দুঃখকে জয় করিতে হইবে। দুঃখকে ভয় করিয়া কোনও লাভ নাই। দুঃখে পড়িয়া

আর্ত্তনাদও করিব না। সহস্র দুঃখের দুঃসহ দাবদাহ অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া বীরের মত সংসারের সমরাঙ্গণে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িব,—ইহাই প্রয়োজন। আমাদিগকে উভরোলে কাঁদিবার শিক্ষা যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্র-ভৈরব নর্ত্তনে আমাদের মাতিতে হইবে। প্রেম আর পৌরুষে তফাৎ কোথায়? দুর্ব্বলের প্রেম অধিকাংশ সময়ে অপ্রেমেরই রূপান্তর। শক্তিমানের প্রেমই প্রেম। এস, আমরা শক্তিমান্ হই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**(৩৬)**

হরিওঁ বারাণসী

২৭শে আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ত্যাগ শক্তির প্রতীক। ত্যাগ শক্তির জনক। ত্যাগ ছাড়া জাতি বড় হয় না,—সমাজও না, সংসারও না, ব্যক্তিও না। সর্ব্বদা এই চিন্তায় ডুবিয়া থাক যে, দেহ তুমি জগতের কল্যাণের জন্য পাইয়াছ, নিজের ক্ষুদ্র সুখ আর তুচ্ছ স্বার্থের জন্যই নহে। এ ভাবনা প্রবল হইলে দেহাতীত এক মহাবীর্য্য তোমার মধ্যে





উৎপন্ন হইবে, যাহা দ্বারা তুমি সত্য সত্যই জগদুদ্ধার করিবে।

সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণ করিবে। ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া জগতের কাজ কর। জগৎকে ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান কর, নিজেকে জগতের সহিত অভিন্ন জ্ঞান কর, নিজেকে ভগগানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান কর। এই অভেদত্ব-বোধ গর্ব্ব বা অহংকার হইতে উপজাত হয় না, বরং গর্ব্ব বা অহমিকা দ্বারা নষ্ট হয়। ভগবানে একান্তভাবে শরণ লইয়া ভগবানের পরমাশ্রিত হইলে এই অভেদত্ব জাগে। এই অভেদত্ব প্রতিষ্ঠাই কর্ম্মযোগের ভূমিকা। ভগবানের কাজ করিতে হইলে সেব্য, সেবক ও সেবাকে অভিন্ন বলিয়া জানিতে হইবে।

সংসারে থাকিয়াও সংসারের সহস্র মলিনতার ঊর্দ্ধে তোমরা থাকিবে, ইহাই তোমাদের জন্য আমার আশীর্ব্বাদ। সংসারকে বর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরানুধ্যানে বা আত্মোৎকর্ষ-বিধানে জীবন সমর্পণ করিবার আহ্বান নিয়া অনেক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহারা মানুষকে শান্তি দিয়াছেন, সার্থকতা দিয়াছেন কিন্তু এই মানুষগুলিকে দিয়া জাতিগঠন করিয়া যাইতে পারেন নাই। একটি মানুষ ভূমার আহ্বানে সংসার-সুখ বর্জ্জন করিয়া হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশ-দেশান্তরে ছুটিয়া চলিল, এ দৃশ্য মধুর ও মনোহর কিন্তু ইহা দ্বারা সমগ্র জাতির জন্য সেই শৌর্য্য জাগরিত হইল কি, যাহা জাতিকে ধারাবাহিক ভাবে স্বাধীন ইচ্ছায় নিজের ধর্ম্মানুসরণে ও ধর্ম্মাচরণে নিরঙ্কুশ করিবে?

সেই বীর্য্য জাতিকে দিল কি, যাহা দ্বারা ধর্ম্মধ্বংসকর অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্পেষণকে মুখের মত জবাব দিয়া স্তব্ধ করা যাইবে? ঈশ্বরানুরাগীর সংসার-বর্জ্জনের ভিতরে তাঁহার ব্যক্তিগত চরিতার্থতা অসামান্য কিন্তু জাতিগতভাবে তাঁহার স্বদেশবাসীরা ধর্মাচরণের নিষ্ঠা পরিরক্ষণের জন্য কোনও মূল্যবান্ সম্পদ পাইল কি? ঈশ্বরানুরাগী সংসার-বর্জ্জনের সম্পর্কে ইহা বর্ত্তমান যুগে চিন্তাশীল মানুষদের একটী সাধারণ জিজ্ঞাসা।

এই জন্যই আমি তোমাদিগকে দলে দলে সংসার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেই নাই বা উৎসাহ দেই নাই। সংসারে থাকিয়া সংগ্রাম করিয়া ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের মধ্যে শৌর্য্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য। এজন্য তোমাদের সংসারে অনাশক্ত থাকিয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালনের দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তোমরা প্রত্যেকে কেবল নিজেরই উদ্ধারকারী নহ, তোমরা প্রত্যেকে জাতির সৃষ্টিকারী শক্তিধর যোদ্ধা। একথা মনে রাখিতে হইবে।

তথাপি জগতে সংসার-ত্যাগীদের প্রয়োজন আছে, তাঁহারা নিজ নিজ সময়ে সুনিশ্চিত আত্মপ্রকাশ করিবেন। জগতের প্রতি অফুরন্ত প্রেম তাঁহাদিগকে যথাকালে টানিয়া আনিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ





(৩৭)

হরিওঁ

বারাণসী

শুক্রবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৭২

(১৫-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অমুকে বা তমুকে তোমাদের আয়োজিত সমবেত উপাসনা-গুলিতে আসিতে পারে না বলিয়া তাহাদের গৃহে সমবেত উপাসনা হইলে তোমরা যাইবে না, এই জাতীয় প্রতিশোধ-পরায়ণ কুবুদ্ধি তোমাদের রাখা ঠিক নহে। কেহ প্রচলিত প্রথাগত বিধিতে অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, বিবাহ আদি অনুষ্ঠান না করিয়া অখণ্ড-বিধিমতে করিলে অখণ্ড-বিধানের প্রতি তোমাদের অন্তরের অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজনেও এই সকল ক্ষেত্রে তোমাদের দলে দলে সমবেত উপাসনায় যোগদান করা উচিত।

মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায় প্রভৃতি হইতে উদ্ধারের জন্য আগেকার দিনে গলায় গামছা দিয়া দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। আমাদের সমবেত উপাসনার নিমন্ত্রণকে তোমরা সেই নিষ্ঠুর পর্য্যায়ে নামাইয়া দিও না। সমবেত উপাসনার নিমন্ত্রণে একটী সরল আহ্বানই যথেষ্ট। কুস্থানে কদুদ্দেশ্যে যদি এই আহ্বান না হয়, তবে, কে নিমন্ত্রণ

করিল, কেমন করিয়া করিল, এই সব গবেষণা নিরর্থক। সমবেত উপাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কেহ কাহারও উপরে মনের ঝাল মিটাইবে, ইহা অতীব জঘন্য ব্যাপার।

সংসারের অন্য পাঁচটা কাজ দোষে গুণে মিশ্রিত থাকে। কিন্তু সমবেত উপাসনার ব্যাপারে তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ অন্তরের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিও। ক্রোধ, হিংসা, নিন্দা, বিদ্বেষ, দলাদলি, আক্রোশ, কুচক্র এবং ষড়যন্ত্রপরায়ণতা যেন সমবেত উপাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কদাচ অনুশীলিত না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৩৮)

হরিওঁ বারাণসী

২৮শে আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানে ভ্রমণ-তালিকা করিবার জন্য লিখিয়াছ। এইরূপ পত্র আরও বহুস্থান হইতে পাইতেছি। শারীরিক অপটুতার দরুণ এখন বেশ কতক মাস ভ্রমণ করিতে পারিব না। সকল স্থানেই আমার যাইবার এবং তোমাদিগকে দেখিতে পাইবার





প্রবল ইচ্ছা আছে। কিন্তু এখন আমাকে এবং তোমাদিগকে কিছুকাল মনে মনেই সঙ্গ-সুখ পাইতে হইবে। তোমাদের দেখিলে কত কথা কহিব, কত কথা শুনিব। এস, আমরা মনে মনেই কহি এবং মনে মনেই শুনি। মনে মনে কথা কহিলেও তাহা শুনা যায়।

যখন তোমাদের মধ্যে যাইবার সময় হইবে, তখন হয়ত গিয়া কত জনকে মর-দেহে দেখিতে পাইব না। তোমাদের পত্রেই ত' জানিলাম কতজন পঞ্চভূতের দেনা শুধিয়া ইতিমধ্যে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আত্মার শান্তি হউক। জগজ্জনের কল্যানের জন্য যদি তাহাদের পুনরাগমনের প্রয়োজন থাকিয়া থাকে, তবে তাহারা প্রকৃষ্টতর দেহে, উন্নততর পরিবেশে, উচ্চতর কর্ত্তব্যসমূহ পালনের জন্য যোগ্য ভাবে আবির্ভূত হউক। পরমেশ্বরের কৃপা তাহাদের পুনরাগমনের মধ্য দিয়া নবতর ব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠুক।

তোমাদের ওখানকার অসমীয়াভাষী প্রাচীনগণ এতকাল পরেও আমাকে স্নেহসহকারে স্মরণ করিতেছেন জানিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাঁহাদের এই প্রেমের জন্য তাঁহাদিগকে আমার প্রাণভরা ধন্যবাদ জানাইও। যাঁহার মাতৃভাষা যাহাই হউক, আমি সকলকেই আমার প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানিয়া থাকি। আমার অন্তরে ভাষা-বিদ্বেষ নাই। ভাবই ভাষার আশ্রয়, ভাবেই ভাষার সার্থকতা। আমি সেই মহাভাবকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি,

যাহা হইতে জগতের সকল দেশের সকল কালের সকল ভাষার উৎপত্তি। তোমরা প্রত্যেকে অসমিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে যত্ন নিবে। যখন যাহাকে যেই দেশেই যাইতে হয়, সেই দেশের ভাষাকে প্রত্যেকে সমাদর করিবে। এক মানুষের ভাষার প্রতি অন্য মানুষের বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নিতান্ত হেয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

ভাবের উচ্চতায় তোমরা অভ্রংলিহ হও। চিন্তার দৈন্য পরিহার কর। উচ্চতম চিন্তার চর্চ্চা কর। চিন্তার উচ্চতা তোমাদের কর্ম্মকে নিয়ত উচ্চস্তরে থাকিতে বাধ্য করুক। উচ্চচিন্তা তখনি স্বার্থক, যখন তাহা উচ্চকর্ম্মের প্রেরয়িত্রী হয়।

যাহাকে দেখিবে, তাঁহাকে লইয়া সৎপ্রসঙ্গই করিবে। বাজে প্রসঙ্গ তুলিবে না। বাক্যই ব্রহ্ম। তোমাদের প্রতিজনের কথাবার্ত্তায় কেবল ব্রহ্মনাদই উদ্গীথ হউক। কথা তখনি তপস্যা, যখন ইহা ঈশ্বর চিন্তার উদ্দীপিকা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**(৩৯)**

হরিওঁ

বারাণসী

২৮শে আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এত বড় একটা সহরে তোমরা মাত্র তিন চারি জন গুরুভ্রাতা







আছ। এজন্য মনে করিও না যে, এই সহরটীর মধ্যে তোমাদের সুসাধ্য কর্ম্ম নাই! যে-কোনও সৎ-প্রচেষ্টার সুরু দুই আর চারি জনেই করিয়া থাকে। চেষ্টায় একনিষ্ঠা থাকিলে আস্তে আস্তে কোন্ অজ্ঞাত দেশ হইতে সহসা অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে নব নব সহকর্ম্মীর আবির্ভাব হয়। তোমরা শুধু সরল মনে এই বিশ্বাসটুকু রাখিও যে, তোমরা নামে মাত্রই শিষ্য হও নাই, প্রকৃতই সাধন করিবার জন্যই শিষ্য হইয়াছ।

তোমাদের নিকট আমার ধন বা মান প্রত্যাশা নহে। তোমাদের ত্যাগ ও সৎকীর্ত্তির দ্বারা আমি যশও অর্জ্জন করিতে চাহি না। তোমরা যে নির্ব্বিচার আনুগত্যের মধ্য দিয়া তোমাদের সেবার শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া জগতে এমন এক মহাজাতি সৃষ্টি করিয়াছ, যাহারা বিদ্বেষের বলে নহে, প্রেমের বলে জগজ্জয় করে, আমি একমাত্র ইহাই দেখিতে চাহি। নিজ নিজ ক্ষুদ্র সংসারের কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদিগকে আবদ্ধ না রাখিয়া, এমন একস্থানে তোমরা তোমাদের সংসার-নিরপেক্ষ নির্ভীক্ মনটীকে সংলগ্ন কর, যেখানে নিখিল-বিশ্বের সহিত তোমরা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে এবং সকল ছোটকে তুচ্ছতার হীনতা হইতে মুক্ত করিয়া উন্নত ও মহীয়ান্ করিয়া তুলিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৪০)

হরিওঁ বারাণসী

শনিবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৩৭২

(৬-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের প্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। অনন্ত শৌর্য্য সহকারে তোমরা আদর্শের সেবা কর। জীবনকে মহৎ কর্ম্মে লাগাইতে হইবে, এই পণ কদাচ পরিহার করিও না।

চারিদিকে তোমরা নবজাগরণ সৃষ্টি কর। দিকে দিকে মানুষের মনে উন্নতির অভীপ্সা এবং আত্মবিকাশের প্রয়াস জাগ্রত কর।

আগামী বৎসর তোমরা যে কাজে হাত দিবে, এখনই তোমরা তাহার আয়োজনগুলি পূর্ণ করিবার দিকে মন দাও। আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীতে তোমরা যাহা ঘটাইবে, অদ্যকার দিন হইতেই তাহার শুভ সূচনা আরম্ভ কর। দূরে রাখিবে দৃষ্টি, নিকটে রাখিবে হস্ত, ধ্যানের বলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে রচনা করিবে সেতু।

যেখানে যে কিশোর বা যুবককে দেখিতে পাও, তাহাকেই ডাকিয়া আনিয়া ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যবাণী শুনাও। অতীতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বাণী শুনাইবার জন্যই ঋষি হইয়াছিলেন, গুরুকুল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তোমরা, তাঁহাদের বংশধরেরা,





তাঁহাদের আসন গ্রহণ কর। সমগ্র জগৎকে যে পরিচালিত করিবে, বর্ত্তমানের যুবকদের মধ্যে বজ্রদৃঢ় চরিত্রবল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে তাহার মৌলিক প্রয়াস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৪১)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মঙ্গলময় ভগবানের নামে মন লাগাইয়া রাখিও। ইহার চেয়ে শান্তি আর কিছু নাই। সংসারের সহস্র কর্ত্তব্যের মাঝখানেও পরম প্রেমময় প্রভুর চরণে নিজেকে নিয়ত সমর্পণের সাধনার চেয়ে আনন্দময় ব্রত মনুষ্য-জীবনে আর কিছু হইতে পারে না। তাঁহার উপরে নির্ভর করিলে ক্ষুব্ধ, রুষ্ট, অচঞ্চল ও অস্থির মন আপনা আপনি স্নিগ্ধ, শান্ত ও চঞ্চল হয়। শান্ত মনের যে অধিকারী, এই জগতে সে-ই প্রকৃত সুখী।

তোমরা প্রত্যেকে প্রকৃত সুখের অধিকারী হও এবং জগতের সকলকে যথার্থ সুখের আস্বাদন দিয়া কৃতার্থ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৪২)

হরিওঁ বারাণসী

২৯শে আশ্বিন, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ত্যাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার ন্যায় ত্যাগেচ্ছা সকলের মনে জাগিলে জগতে কত সব অসামান্য কাজ হইতে পারিত।

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে মানুষের মনে ত্যাগেচ্ছা আসে না। আবার, ত্যাগেচ্ছা না জাগিলে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয় না। এই জন্যই বুদ্ধ, যিশু, নানক, চৈতন্য আদি জগতের সকল মহাপুরুষেরা মানুষের মনে ত্যাগেচ্ছা জাগাইবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়াছেন। আবার, চিত্তকে শুদ্ধ করিবার পরমোৎকৃষ্ট উপায় স্বরূপে পরমেশ্বরে বা শাশ্বত কুশলে ধ্যানার্পণ করিবার পথও দেখাইয়াছেন।

অতীতে ত্যাগের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া ত্যাগের সেই মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইবে। কারণ, ত্যাগই অমৃত, ত্যাগই শাশ্বত। তোমরা প্রতি জনে ত্যাগী হও এবং নিজেদের দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র অনুকক্ষ পুরুষ-নারীকে অনুপ্রাণিত কর।

স্বকীয় কর্ত্তব্য-নিচয়ে অবহেলা করিয়া ভেক ধরিয়া বৃক্ষতলে





আসন গাড়িবার নাম ত্যাগ নহে। স্বকীয় কর্ত্তব্যের দায় পূর্ণ ভাবে মিটাইবার চেষ্টায় সম্যক্ আগ্রহী রহিয়াও জগজ্জনের সর্ব্বশুভ সম্পাদনের জন্য নিয়ত ব্যক্তিগত স্বার্থকে তিলে তিলে (এবং যাহার পক্ষে সাধ্য, তাহার পক্ষে তালে তালে) বিসর্জ্জন দিবার সাধনারই নাম ত্যাগ। ত্যাগকে তোমরা প্রকৃত অর্থে বুঝিবার চেষ্টা করিও, বিকৃত করিয়া বুঝিও না। প্রকৃত ত্যাগ প্রেমের হাতে হাত রাখিয়া, প্রেমের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া চলে। প্রেম কদাচ মানুষকে কর্ত্তব্য হইতে দূরে সরাইয়া নিতে পারে না। কারণ, এক স্থানে যাহার প্রেম, সর্ব্বভূতে তাহার প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ বারাণসী

রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৭২

(১৭-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট ভুল-বুঝাবুঝিগুলি সম্প্রীতি সহকারে দূর করিয়া না দিলে কদাচ প্রগাঢ় ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও তুচ্ছ অভিযোগটি মন হইতে দূর

হইয়া যাউক। কাহারও অভিযোগ করিবার কোনও কারণ থাকিলে সদ্ব্যবহারের দ্বারা তাহাকে তাহার অভিযোগ তুলিয়া নিবার মনোভঙ্গীতে টানিয়া নিতে হইবে। শুধু ধমক দিয়া বা ধামাচাপা দিয়া কাহারও অসন্তোষ দূর করা যায় না। ক্ষমা করিবার শক্তি ও অতীত ভুলিবার সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে কলহ মিটে না। কিন্তু অভিযোগের যাহা কারণ, তাহা দূর করিবার কোনও পাকা ব্যবস্থা হইল না, কেবল পিঠ চাপড়াইয়া বা টেবিল দাবড়াইয়া অন্যের অভিযোগ চাপা দিয়া দেওয়া হইল, ইহাতে সাময়িক শান্তি পরিলক্ষিত হইলেও কাহারও প্রকৃত ক্ষোভের মূলোৎপাটন হয় না।

তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রয়োজনেই তোমরা নিজেদের মধ্যে কলহ করার কদভ্যাস বর্জ্জন কর। কলহের সম্ভাবনা দেখামাত্র তাহার কারণটি খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে কলহের কারণটিকে সজোরে দূর করিয়া ফেলিয়া দিবে। এ কাজে বিলম্ব করিবে না অথবা লোক-দেখানো সালিশী করিবে না। যাহা করিলে উভয় পক্ষের ক্ষোভ দূর হইবে এবং যাহা করিলে উভয় পক্ষকে কলহের পূর্ব্বকালীন সম্প্রীতির আবহাওয়ার মধ্যে আনা যাইবে তাহাই তোমাদের করিতে হইবে। সমষ্টির কুশলের দিকে তাকাইয়া এই সময়ে তোমাদের চলিতে হইবে, ব্যক্তিগত রুষ্টি-তুষ্টির দিকে নহে।





একটী ধ্যান, একটী আদর্শ, একটী লক্ষ্য যদি ধারাবাহিক প্রযত্নে তোমরা পুরুষানুক্রমিক ভাবে ধরিয়া চলিতে পার, জানিও, ভাবী জগতের ভাগ্য-লিপি-রচনার ভার তোমাদেরই উপর। কথাটাকে কেবল একটা কথাই মনে করিও না, একটা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিও। এই সত্যে যদি বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হইলে আমার একটি উপদেশ পালনেও তোমাদের আগ্রহাভাব হইতে পারে না। প্রেম দিয়া সকলকে আপন কর, কলহ দিয়া আপনজনদিগকে পর করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**(৪৪)**

হরিওঁ বারাণসী

সোমবার, ১লা কার্ত্তিক, ১৩৬২

(১৮-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অতীতের অপরাধের কথা চিন্তা করিয়া মনকে দুর্ব্বল করিও না। ভবিষ্যতে যাহাতে অপরাধমুক্ত জীবন যাপন করিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টিত হও। অতীতে কি কারণে তোমার মতিভ্রম হইয়াছিল, তাহা স্মরণ রাখা ভাল। কারণ, ঐরূপ পরিস্থিতি জীবনে আর কখনো যাহাতে সৃষ্ট না হইতে পারে, তার জন্য

যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন আছে। মানুষ জীবনে যত ভুল করে, তাহার অধিকাংশই করে অবস্থার দায়ে ঠেকিয়া। যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া তোমার ন্যায় পবিত্রচেতা পুরুষও অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিতে পারিল, সেইরূপ অবস্থা যাহাতে কদাচ তোমাকে ঘেরিয়া আর না ঘটিতে পারে, তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা নিশ্চয়ই আবশ্যক। ভুলকে যদি ভুল বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তাহার সংশোধন সহজ। ভুলকে যদি মহাপ্রাণতা কর্ত্তব্য-পালন, বন্ধুত্ব-রক্ষা, সুজনতা বা শিল্পচর্চ্চা ইত্যাদি বলিয়া দার্শনিক ব্যখ্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ধোপ-দেওয়া শুভ্র রুমালখণ্ডে রক্ষিত কদর্য্য কফের ডেলার মত যত্ন করিয়া বুক-পকেটে গুঁজিয়া রাখিবার কুবুদ্ধি জন্মে, তবে তোমার ভ্রম-সংশোধন এই জীবনে হইবার নহে।

যাহা করিয়াছ, করিয়াছ, আর করিবে না। এই সংকল্প কর। যাহার নিকটে যেটুকু নম্র হওয়াতে তোমার এই অবনতি ঘটিল, তাহার সম্পর্কে সেই নম্রতা, সেই দুর্ব্বলতা পরিহার কর। যাহাদের প্ররোচনায় কান পাতিবার ফলে তোমার সুতীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞান নিমেষে ভোঁতা হইয়া গেল, দুর্ব্বল হইয়া গেল জীবনের প্রবলতম আগ্রহগুলি, মন হইতে মুছিয়া গেল বদ্ধমূল দৃঢ়নিবদ্ধ সংকল্প-নিচয়, তাহাদের প্ররোচনা যে জগতে পৌঁছে না, এমন জগতের বাসিন্দা হও।

বনে জঙ্গলে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আছ জানিয়া চিন্তিত হইলাম। তবে, বিশ্বাস রাখিও, কোনও বিপদ হইবে না। বনের





জংলী হাতী বা আকাশের বোমারু বিমান, ইহাদের কোনও কিছুতেই ভয় পাইও না। নির্ভয়ে কর্ত্তব্য করিয়া যাও। কর্ত্তব্য-পরায়ণ সৎসঙ্কল্প মানুষকে ভগবান পদে পদে সহায়তা করেন। পরমেশ্বরে প্রেম রাখিয়া প্রতিটি পদক্ষেপ কর, পরমেশ্বর-সৃষ্ট জগতের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি প্রেম রাখিয়া প্রতি কার্য্যে হস্ত প্রসারণ কর। পরমেশ্বরের ইচ্ছাই তোমার জীবনে সত্য হইয়া উঠুক, এই আগ্রহ লইয়া কাজ করিতে থাক। জীবনের সহস্র ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়াও অভ্রান্ত সত্যের দিব্য জগতে তুমি নিশ্চিত পৌঁছিতে পারিবে, এই বিশ্বাস রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৪৫)

হরিওঁ

বারাণসী

১লা কার্ত্তিক, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদাই শুধু নিজের অসুখ ও নিজের অশান্তির চিন্তা নিয়া আছ। ইহা কেবল স্বার্থপরতাই নহে, ইহা মনের একটা ব্যাধিও। মানুষ কেবলই আত্মকেন্দ্রিক নহে, তাহার স্বভাবের মধ্যেই পরার্থপরতা রহিয়া গিয়াছে। মানুষ যখন স্বভাব-ভ্রষ্ট, মাত্র তখনই শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থে নিঃশেষে মজিয়া থাকিতে পারে। তুমি তোমার স্বভাবকে চিনিতে চেষ্টা কর।

স্বার্থপর কেবল স্বার্থপরই নহে, সে তাহার প্রকৃত স্বার্থের হন্তারক।

তোমার স্ব কি, তোমার যথার্থ স্বার্থই বা কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর। আমার আমার বলিয়া যেই জিনিসগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছ, তাহার কোন্‌টী যথার্থই তোমার?

বিশ্বাস কর আর না কর, ঈশ্বরের নাম জপ কর। ঈশ্বর যদি নাও থাকেন, সত্য আছে। জপিতে জপিতে সেই সত্যের সাক্ষাতকার পাইবে। ভক্তেরা, জ্ঞানীরা, সাধকেরা বলিয়াছেন, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। ঈশ্বর যদি মিথ্যা হইয়া থাকেন, তাঁর নাম জপিতে জপিতে তিনি নিজেই পলায়ন করিবেন। তখন আর তোমাকে তর্ক করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে না যে, তিনি নাই, ছিলেন না, থাকিতে পারেন না।

তোমার আস্তিক্য ও নাস্তিক্য ত' তোমার স্বার্থের মুখ চাহিয়া চলিতেছে। এই জন্যই তোমার আস্তিক্যও মিথ্যা হইয়া যাইতেছে, নাস্তিক্যও। তোমার স্বার্থের সহিত সুসমঞ্জস হইলে তুমি ঈশ্বর মান, না হইলে তুমি ঈশ্বর অস্বীকার কর। ঈশ্বর এমন বস্তু নহেন যে, এক কথায় তাঁহাকে স্বীকার করা যায় বা অস্বীকার করা যায়। জীবনের সমস্ত কথা শেষ হইয়া গেলে তবে ঈশ্বরের কথা সুরু হয়। স্বার্থ তোমাকে দিয়া দেবতা গড়াইতেছে, স্বার্থই তোমাকে দিয়া দেবতা ভাঙ্গিতেছে, মন্দির ভাঙ্গিতেছে, তীর্থ ভাঙ্গিতেছে। স্বার্থের বশ না হইয়া আগে স্ববশ হও।





স্ববশ হইবার জন্যই ঈশ্বরকে প্রয়োজন। স্ববশ হইবার পরে তিনি মিথ্যা হইলে আপনি চলিয়া যাইবেন, সত্য হইয়া থাকিলে বিনা যুক্তিতে বিনা চুক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকিবেন। তোমার স্বার্থবোধ রূপ মনোব্যাধি দূর করিবার জন্য আগে ব্রতী হও। এর চেয়ে বড় কাজ তোমার আর কি আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ বারাণসী

২রা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৭২

(১৯-১০-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিবাহ না করিয়া চলিতে দারুণ কষ্টবোধ করিলে বিবাহ করা সঙ্গতই হইবে। কিন্তু বিবাহে যেমন সুখ আছে, তেমন দায়িত্ব আছে, বোঝা আছে, অনিশ্চয়তা আছে। বিবাহের জন্য মন খুব কাতর না হইলে বিবাহ করিবার ঝক্কি নেওয়া উচিত নহে।

সর্ব্বদা নাম কর। নাম করিতে করিতে কর্ত্তব্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ বারাণসী

২রা কার্ত্তিক, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিপদে পড়িলেই কেবল ভগবানকে ডাকিবে আর সম্পদের সময়ে তাহাকে ভুলিয়া থাকিবে, ইহা বড় লজ্জার কথা। সম্পদে বিপদে সকল সময়ে ভগবানকে ডাক। তাহাকে আপন বলিয়া জান, আপন বলিয়া ভাব, আপন বলিয়া ডাক। পর বলিয়া নহে, দূর বলিয়া নহে, তাহাকে নিকট হইতে নিকটতর জানিয়া ডাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৪৮)

হরিওঁ বারাণসী

৩রা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৭২

(২০-১০-৬৫)

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

হাসপাতালে নার্সের চাকুরী কর বলিয়া পরমেশ্বরের নাম





করিতে তোমার বাধা হইবার কারণ বুঝিলাম না। ভগবানের নাম সকল সময়েই করা যায়। ভগবানে প্রেম রাখিয়া বিশ্বাস রাখিয়া শুচি বা অশুচি সকল অবস্থায় নাম করা চলে। তবে, নিয়মিত সময়ে নামজপাদি শুচি-শুদ্ধ হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া করাই ভাল। অন্য সকল সময়েই নাম করা যায়, নাম করার কোনও বাধা নাই, বরং সকল সময়েই নিয়ত নাম স্মরণ করিয়া নিজের চেতনাকে দেহাতীত রাখিবার চেষ্টা সঙ্গত। হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী বলিয়া তুমি অস্পৃশ্যাও নহ, অন্ত্যজও নহ। শুশ্রূষাকারিণীর কাজ অতি পবিত্র কাজ, ইহা জনসেবার কাজ। জনসেবার মধ্য দিয়া তোমরা ভগবানের সেবা করিতেছ, এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিবে। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন এবং যে-কোনও জীবকে নিষ্ঠা সহ শুদ্ধ মনে সেবা দান কর না কেন, তাহা শ্রীভগবানের কমল-চরণে গিয়া পৌঁছে।

সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কে জনৈক ভাগবত-পাঠক তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত তোমার কোনও সম্পর্ক নাই। যাঁহারা তাঁহার মতে ও তাঁহার পথে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিবে বা করিতেছে, ঐ সকল রহস্য তাহাদের জন্য। ঐ সকল তত্ত্বকথা সারগর্ভ বা অসার, এই বিষয়ে বিচার-বিতর্কে প্রবেশ করিবারও তোমার প্রয়োজন নাই। যেহেতু ঐ সকল কথা কোনও এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্ব সম্পর্কিত কথা, সেইহেতু

উহাদিগকে বিচার-বিতর্কের দ্বারা খণ্ডনের চেষ্টায়ও তোমার যাইবার প্রায়োজন নাই। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজমতে চলিতে দাও, তুমি তোমার মতে চল। তুমি যে মত ও পথের নির্দ্দেশ পাইয়াছ, তাহাও যোগ্য আচার্য্যদেরই পরিসাধিত মহান পন্থা। অন্যের কথার ভাল-মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের মত ও পথের সম্পর্কে একটী নিমেষের জন্য বিস্মরণশীল হইও না। একটী নিমেষের বিস্মরণকেও সাময়িক মৃত্যু বলিয়া গণনা করিবে। নিয়ত ইষ্ট স্মরণে থাকার নামই জীবন। তোমাদের জীবন জাগ্রত জীবন হউক, এ জীবনে যেন তন্দ্রার আর বিস্মরণের কোনও স্থান না থাকে।

প্রণবমন্ত্র ওঙ্কারকে অপ্রাচীন বা আধুনিক প্রমাণ করিবার জন্য কেহ যদি বলে যে, ক্লীং মন্ত্র বা হ্রীং মন্ত্র হইতে তাহার উৎপত্তি, তাহা হইলে সেই কথায় কর্ণপাত করিও না। যেই মন্ত্র হইতে সকল মন্ত্রের উৎপত্তি, যেই মন্ত্রে সকল মন্ত্রের বিলয়, এমন মন্ত্রকে প্রণব বলা হইয়া থাকে। কেহ নিজগুরুর কাছ হইতে প্রাপ্ত অন্য কোনও মন্ত্রে ঈশ্বর-ভজন করিতে চাহেন ত' ভাল কথা, প্রণব-সাধকের তাহার সহিত কোনও কলহ নাই। জগতের যে যেখানে যে ভাবে পারে, পরমেশ্বরে লগ্ন হউক। লগ্ন হওয়াই বড় কথা, অন্য কথা তাহার চেয়ে ছোট। কিন্তু প্রণবমন্ত্রে সাধন করিতে যে উপদেশ পাইয়াছে, প্রণব-মন্ত্র হইতে তাহার বিচ্যুত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই।





প্রণবমন্ত্র এমন এক যুগে ভারতের গগনে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া দেখিয়া ভূপর্য্যটনরত আর্য্য ঋষিগণ যখন মূর্ত্তি দিয়া ঈশ্বরের সাধন করিতেন না। মূর্ত্তির পরিকল্পনা ও পূজা আর্য্যবংশধরদের মধ্যে তাহার বহু পরে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রণবমন্ত্রে উদাত্ত কণ্ঠে যাঁহারা ঈশ্বরসাধনা করিতেন, তাঁহাদের মূর্ত্তিপূজার কোনও প্রয়োজন-বোধও ছিল না । কিন্তু নানারূপ মূর্ত্তি পরিকল্পনা করিয়া পরমেশ্বরকে যাঁহারা নানা স্থানে ডাকিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটী পরিকল্পনার পশ্চাতে এক একটী বীজমন্ত্র ছিল। ঐ সকল পরিকল্পনার বিচিত্র বিভিন্নতা এবং ঐ সকল বীজমন্ত্রের ধ্বনিগত পার্থক্য সম্প্রদায়-বোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁহারা প্রণবের সাধক, তাঁহারা সকল বীজকে একই মহাবীজের অংশ জানিয়া, সকল মূর্ত্তি-পরিকল্পনাকে একই অমূর্ত্ত প্রভুর পরিবিকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "ওম্" "yes" "হ্যাঁ"। সর্ব্বস্বীকৃতির এই অসামান্য সামর্থ্যের মধ্য দিয়া প্রণবের অলঙঘনীয় কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ভিতরে কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের কারিকুরি নাই। অন্যান্যেরা, যে মন্ত্রে ভাল লাগে, পরমেশ্বরকে ডাকুন,—তোমরা কদাচ প্রণব-মন্ত্র ছাড়িও না।

বেদে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। আদিপৌরাণিক কালে বিষ্ণু বলিতে, গোলোক-বৈকুণ্ঠ-বিহারী

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এক দেবতাকে বুঝান হইয়াছে। অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক পৌরাণিক যুগে বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে। আর, চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধাকে সহ একদেহে আবির্ভূত হইয়া কলির পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, ভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এই কথা বলিয়াছেন। এই যে বিষ্ণু-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, ইহা ঐ নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সাধকেরা যেরূপ মনোময় প্রাণময় করিয়া উপভোগ করিতে পারিবেন, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এমনকি নিম্বার্কাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যদের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও ঠিক সেই ভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন না, যেই বিশেষ ভঙ্গীতে তোমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুখে এই তত্ত্ব শুনিতেছ। যিনি যেমন আচার্য্যের কাছ হইতে দীক্ষা নিয়াছেন, তাঁহাকে সে আচার্য্যের গুরু-পরম্পরানুযায়ী ব্যাখ্যার পথে চলতে হইবে,—কারণ ইহা তাহার পক্ষে সুগম। এই ব্যাপারে অন্যের মাথাব্যথা কেহই গ্রাহ্য করিবে না। জীবের সহিত ভগবানের অখণ্ড সম্বন্ধ নিয়া অনন্ত আলোচনা হইবে। যাহার যাহা হিতকর ও প্রীতিকর, সে তাহাতে ডুবিবে। অন্যের এই অভিনিবেশে তুমি বাধাসৃষ্টি করিও না। কিন্তু তোমার নিজের অভিনিবেশের মধ্যে নানা মত ও নানা পথকে প্রবেশ করিতে দিও না। কারণ, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, তাহা কেবল ধর্ম্মই নহে, তাহা জাতি-সৃষ্টির মূলমন্ত্র।





খুব কাছাকাছি সময়ে ভারতে নানক, কবীর, রামানন্দ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র নানক ব্যতীত অন্য কোনও আচার্য্য সম্পর্কে ইতিহাসের গবেষকগণ এ কথা বলেন না যে, ইহারা জাতিসৃষ্টির উপকরণ যোগাইয়াছেন, যদিও ইঁহাদিগকে সংস্কারক বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ নামে প্রেমে বিপুল বন্যা বহাইয়াছিলেন, এই বন্যার স্রোতে যে পড়িয়াছে, সে-ই ডুবিয়াছে। তাঁহার নাম-সঙ্কীর্ত্তন এমন বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল যে, যেখানে তিনি যখনি গিয়াছেন, মানুষের তর্ক করিবার প্রবৃত্তি লোপ পাইয়াছে, মানুষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইয়াছে। কবীর ত' এমনই অসামান্য প্রভাব, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলের মধ্যে বিস্তারিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহের মুসলমানি মতে সমাধি হইবে, না, হিন্দুমতে অগ্নিসংস্কার হইবে, ইহা নিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরেই দারুণ কলহ হইয়াছিল এবং অলৌকিক ভাবে ইহার মীমাংসা না হইয়া গেলে হয়ত এই ব্যাপারেই দীর্ঘস্থায়ী রক্তারক্তির ইতিহাস রচিত হইত। উল্লিখিত আচার্য্যদের প্রত্যেকেরই শিক্ষা ও উপদেশ বদ্ধমূল জাতিভেদ-প্রথার গোঁড়ামিকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এক নানক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ঐতিহাসিকেরা জাতিস্রষ্টা বা nation-builder বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কথাটী চিন্তনীয়। রামানন্দ একজন রামচন্দ্রকে ভজনীয় করাতে সকল শ্রেণীর মানুষ আকৃষ্ট হয় নাই। একজন ঐতিহাসিক এরূপ লিখিয়াছেন। সত্য কথাই। অবতার-বাদ সকল মানুষের পছন্দের জিনিষ নাও হইতে পারে। একটী অবতারকে মানিলে গৌণভাবে অতীতের আরও বহু অবতার মানিতে হয় এবং ভবিষ্যতে আরও যে সকল মহাপুরুষ অবতার পদবীর অধিকার দাবী করিবেন, তাঁহাদের সম্পর্কে মনকে উদার রাখিতে হয়। নানক অবতার-বাদ মানেন নাই। এই জন্যই তাঁহাকে অবতার বানাইয়া শিখরা মনকে ভূলাইতে চাহেন নাই, তাঁহারা তাঁহাকে গুরু জানিয়া গুরু-বাক্য প্রতিপালনের জন্য জীবনোৎসর্গে প্রস্তুত হইলেন। কবীর হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে ভাবগত বিরোধ দূর করিয়া দিলেন কিন্তু দুইটী প্রধান কারণে তিনি জাতি-সৃষ্টি করিতে পরিলেন না। একটী হইতেছে এই যে, তাঁহার সকল শিষ্য যাঁহাকে মানিবে, এমন প্রতিনিধি তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই এবং পর পর প্রতিনিধিরা একই লক্ষ্যে ধারাগতভাবে কাজ করিয়া যান নাই। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে এই যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবগত বিরোধ দূর করিলেও সমাজগত ভাবে কোনও নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। নানক ব্যাপক ভাবে বা তখন তখনই তাহা করিতে না পারিলেও, আস্তে আস্তে এবং পরম্পরাগত ভাবে তাহা ঘটাইবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। অথবা, এই ব্যাপারে তিনি সত্য সত্য





সফল হইয়াছিলেন কিনা, এই বিষয়ে তথ্যগত সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকিলেও ইহা সত্য যে, তিনি অহিন্দুদের জন্য শিখ-সম্প্রদায়ে প্রবেশের দুয়ার মুক্ত করিয়াই রাখিয়াছেন এবং অন্য সম্প্রদায় বা জাতির লোক শিখপন্থে প্রবেশ করিলে সেখানে সামাজিক অধিকারও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য যবন হরিদাসকে ঠাকুর হরিদাস করিয়াছিলেন কিন্তু জগন্নাথ-মন্দিরে তাঁহাকে প্রবেশের অধিকার দিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। চণ্ডালও যদি হরিভক্ত হয়, তবে সে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ইহা মহাপ্রভুরই বাণী কিন্তু একটী হরিদাসই যবন হইতে ঠাকুর হইলেন, দলে দলে যবন হরিদাসদের আবির্ভাব ঘটিল না। জগন্নাথ-মন্দিরের মহাপ্রসাদের ব্যাপারে জাতিভেদের কল্পনা পর্য্যন্ত দূর হইয়া গেল কিন্তু নানা সমাজের লোক আসিয়া শুধু হরিভক্তির মহিমাতেই সকলের সহিত সমান সামাজিক অধিকার অর্জ্জন করিয়া জাতি-সৃষ্টি বা জাতিপুষ্টি করিল না। নানকের লঙ্গরখানার মতই চৈতন্যের মহোৎসবগুলির জাতিভেদ-বুদ্ধি শিথিল করিয়া দিল কিন্তু একজাতি সৃষ্টি হইয়াছে কিনা, ইহা একটা প্রশ্নই রহিয়া গিয়াছে।

নানক যখন তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তখনই কেহ অনুভব করিতে পারে নাই যে, তিনি এক শক্তিমান জাতির আবির্ভাবের সূচনা করিতেছেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা অনুভব করা গিয়াছিল। যাহা করিলে একমুখতা আসে, তাহার দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—পৌরাণিক কাহিনীর

পরিবন্ধনে শিষ্যদের আবদ্ধ করিতে তিনি আসেন নাই, দীর্ঘকালের পরে তিনিই প্রথম বলিলেন, পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরেরও ঊর্দ্ধে, তিনি রাম এবং কৃষ্ণেরও স্রষ্টা। তিনি বলিলেন, ঈশ্বরকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করার প্রয়োজন নাই, তাঁহার নাম আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিতে হয়। তিনি বলিলেন, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনা, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি অপেক্ষা সত্য অধিকতর গরীয়ান্। তিনি বলিলেন, ঈশ্বরস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে সৎকার্য্য সাধনের দ্বারা মুক্তি লভ্য,—ব্রাহ্মণ-ভোজন, গোদান ইত্যাদিতে লাভ নাই। তিনি বলিলেন,—ধর্ম্মকে যাহারা ব্যবসায়ের বস্তু করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ ও মোল্লারা প্রকৃত পথপ্রদর্শক নহেন। তিনি স্বার্থত্যাগ করিবার জন্য প্রত্যেককে প্রবুদ্ধ করিলেন কিন্তু জাগতিক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের সংসার হইতে সরিয়া পড়িবার আগ্রহকে অপ্রশংসা করিলেন, নিন্দনীয় জ্ঞান করিলেন।

প্রকারান্তরে নানক ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে একত্র সংহত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি রাম বা কৃষ্ণাদি অবতারকে দেশপ্রচলিত কোনও দেবদেবীকে আরাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেন না কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মে একটা উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবের সমাবেশ করিলেন। জাতিসৃষ্টির মূল ইহা।

আমি নানক নহি। তাঁহার সহিত নিজেকে তুলিত করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। কিন্তু ওঙ্কার-সাধনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে আমি যে অসাম্প্রদায়িক রূপ দিয়াছি, তাহা জাতিসৃষ্টি করিবে।





তোমরা আমার বাক্যে বিশ্বাস করিও। তোমরা বংশানুক্রমে আমার নির্দ্দেশ পালন করিও। তোমরা তোমাদের চিন্তা, কর্ম্ম ও সাধনার ধারাবাহিকতা তিনশত বৎসর ধরিয়া চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ কর। অন্য কোনও মত, পথ বা সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের বিন্দু মাত্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে তাহাদের নিজপথ অনুসরণ করিতে দাও কিন্তু তোমাকে তোমার পথ হইতে মত ভাঙ্গাইয়া সরাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিবেন, সন্তর্পণে তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর।

দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম থাকিবে কি শৈব-ধর্ম্ম থাকিবে, ইহা একটা প্রশ্নই নহে। মানুষ হিসাবে উন্নত শিরে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সমগ্র জগতের বিরোধ-বিসংবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মবলে এবং ক্ষাত্রবলে যুগবৎ নিজেদের ভূমি নিজেরা অধিকার করিয়া সংসারে আমরা বাঁচিয়া থাকিব কি না, আমাদের ধর্ম্মের বল আমাদের আত্মিক উন্নতির সাথে সাথে আমাদের ঐহিক উন্নতিকেও বাড়াইয়া চলিবে কি না, না কি একদা আমাদের মৃতকঙ্কালগুলি যাদুঘরে প্রদর্শন করিয়া অন্য জাতীয় লোকেরা বলিবে, "এই দেখ, একদা ইহারা ছিল"—ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের সদুত্তর তোমাদেরই দিতে হইবে। ব্রহ্মবলে বলীয়ান্ স্বরূপানন্দ সন্তানেরা তাহার জন্য হৃৎপিণ্ডের রক্ত অঞ্জলি ভরিয়া তর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

(৪৯)

হরিওঁ বারাণসী

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৭২

(২১-১০-৬৫ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অপরের অনিষ্ট করিবে না সঙ্কল্প করিয়া যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত রহিয়াছ, তাহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে। একটীর দ্বারা তোমার ব্যক্তিগত অহিত হইয়াছে, অন্যটীর দ্বারা তোমার দেশের, জাতির ও সর্ব্বসাধারণের ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তোমার পরানিষ্ট হইতে নিবৃত্ত থাকার ফলে তুমি নৈতিক দিক দিয়া লাভবান্ হইয়াছ। অপরের মন্দ করিবে না বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকায় যদি তোমার নিজের কোনও অনিষ্ট হইয়া থাকে, তবে ভগবানের দরবারে তাহা তোমার সুকৃতি রূপে জমা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা দেশ, দশ ও জাতির অনিষ্ট করিল, তাহাদের প্রতি দয়া বশত তুমি একটী রুক্ষ বচনও প্রয়োগ করিলে না, ইহা দ্বারা তুমিও তাহার কৃত অন্যায়গুলির সহকর্ম্মী হইলে।

আত্মরক্ষা ও অহিংসার মধ্যে সামঞ্জস্য চাই। আত্মসম্মান ও ক্ষমার মধ্যে যোগসূত্র থাকা চাই। দস্যুকে সম্পদ ছাড়িয়া দিলে দানের পুণ্য হয় না। এই সকল সহজ কথা বিপরীত বুদ্ধির





ছলে মানুষের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। তোমরা মানুষের স্বাধীন বিচারের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোল।

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সমাজে ও আত্মোপলব্ধিতে আমি স্বাধীন মানুষ থাকিতে চাহি, অপর সকলকে স্বাধীন দেখিতে চাহি। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ যখন তোমরা বুঝিবে, তখন দেখিবে, ঈশ্বর-প্রেমে ও স্বদেশ-সাধনায় বিরোধ নাই, বিশ্বশান্তির কামনা এবং উৎপীড়ককে প্রতিরোধে অসামঞ্জস্য নাই। লোকের কাছে ভাল সাজিবার জন্য তোমরা বড় বড় বুলি কপচাইতে যাইও না, নিজের কাছে খাঁটি থাকাই বড় কথা।

কি করিলে খাঁটি থাকা যায়, অকপট আন্তরিকতা লইয়া নিজের স্বরূপ এবং অপরের সহিত যোগ্য সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তাহার দিকে লক্ষ দাও। বিশ্বকে বাদ দিয়া আত্মোদ্ধার নহে, উন্নততম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বাদ দিয়া জগৎকল্যাণ নহে, প্রত্যেকটী আপাত-বিরোধী ব্যাপারকে একটী সুসমঞ্জস সমন্বয়ে আনিয়া আমাদের জীবনের নাটক। যে যেই ভুমিকাটিই পাইয়া থাকি, উদ্যত কর্ম্মঠতায় এবং অনুগত নম্রতায় তাহাকে পূর্ণ সার্থকতা দিব,—এস এই পণ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৫০)

হরিওঁ বারাণসী

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জেলার প্রত্যেকটী মণ্ডলী নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মণ্ডলীতে গিয়া সমবেত উপাসনা, হরিওঁ কীর্ত্তন ও অখণ্ড-সংহিতা পাঠ চালাইতে থাকিলে ইহা দ্বারা চারিদিকের লোকের সুপ্ত মনে অজ্ঞাতসারে এক বিপুল শক্তির সঞ্চারণা হইবে। শক্তি আসিলেই জাতি জাগে, মেহাশয্যা পরিহার করিয়া উঠিয়া বসে, কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়নে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে বাহির হয়।

যৌবনকে কর বন্দনা, কৈশোরকে কর অর্চ্চনা। প্রত্যেকটী কিশোর ও যুবকের কাছে শ্রদ্ধানত মন লইয়া উপস্থিত হও। শুনাও তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের বাণী। কখনও ভুলিও না, ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের সাফল্যের মেরুদণ্ড। কিশোরী ও যুবতীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যবাণী ছড়াইবার কাজে আমার মায়েরা প্রতিজনে লাগিয়া যাও। একাজটীকে তোমরা সকলের চেয়ে দামী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিও নামী নামী লোকেরা একথা কহিতে বিরত রহিয়াছেন বলিয়াই মনে করিও না, তাঁহাদের নীরবতাই একটা মহৎ শাস্ত্র। দামী দামী লোকেরা কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন বালিয়াই ধরিয়া লইও





না যে, তাঁহাদের কথাই বেদবাণী। যে-কোনও ব্যক্তি ছয়টী মাস বা ছয়টী সপ্তাহ, এমন কি ছয়টী দিন হইলেও, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া দেখ, মনের বল বাড়ে কি না, দেহের তৃপ্তি আসে কি না, প্রাণের পরিধি বিস্তারিত হয় কি না। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার জন্য নামী আর দামী লোকের কথা কুড়াইবার কোন্ প্রয়োজন?

তোমার অপরিপক্কবুদ্ধি অপরিণতবয়স্ক সঙ্গীদিগকে তুচ্ছ করিয়া দেখিও না। ইহাদিগকে শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া আনিয়া বারংবার শুনাইতে থাক যে, ইহারা সুপ্ত সিংহ, এইজন্য মৃগেরা ইহাদের মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে না। ইহারা জাগিয়া উঠুক, বিশ্বের বিপুল সম্পদ এবং অতুল গৌরব ইহারা নিজেদের কর্ম্মের বলে অর্জ্জন করুক। দৈবনির্ভর অদৃষ্টপরায়ণ কাপুরুষগুলিকে তোমরা কর্ম্মের মন্ত্রে জাগাইয়া তোল, বিশ্ববিজয়ের মহতী সাধনায় ইহারা ব্রতী হউক।

যাহাদিগকে প্রাণহীন বলিয়া মনে করিতেছ, ইহারা কেহই নিষ্প্রাণ নহে। অবস্থার তাড়নে, পরিস্থিতির নিষ্পেষণে ইহাদের অনেকের মনুষ্যত্ব চাপা পড়িয়া আছে। তোমরা বারংবার ইহাদিগকে আদর্শের মোহন বেণু শুনাইয়া যাইতে থাক। শুনিতে শুনিতে সহসা এক সময়ে ইহাদেরও প্রাণের বীণা ঝঙ্কৃত, অনুঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে।

শুধু সেবার ব্রতই নহে, এখন তোমাদের রক্ষার ব্রতও

গ্রহণ করিতে হইবে। কতকাল মানুষ অন্ধ হইয়া থাকিবে? কতকাল মানুষ অর্থহীন প্রথার অনুসরণ করিবে? কতকাল ধর্ম্মকে পার্থিব জগতের নির্য্যাতন বাড়াইবার পরোক্ষ সহায় রূপে ব্যবহৃত হইতে দিবে? অন্ধ প্রথার অনুসরণ করিয়া ক্রমশ যে ইহারা ধ্বংসের দিকে ছুটিয়াছে, কে ইহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবে?

আমি তোমাদেরই উপরে ভরসা করিয়া বসিয়া আছি। অথবা কথাটা ভুল বলিলাম। আমি তোমাদেরই উপরে ভরসা করিয়া নিরন্তর কর্ম্মে নিরত আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

(৫১)

হরিওঁ

বারাণসী
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখান হইতে দুই তিন জনের পত্র পাইলাম। মনে হইল, তোমরা মহিলা-কর্ম্মীদের পৃথক্ দায়িত্ব নিয়া কাজ করাটাকে পছন্দ করিতেছ না। এই বিষয়ে কয়েকটী বক্তব্য আছে।

অখণ্ড-মণ্ডলীগুলি স্ত্রী-পুরুষ সকলকে লইয়াই গঠিত। তথাপি





কোনও কোনও সহরে আলাদা করিয়া একটী অখণ্ড-মহিলা-সঙ্ঘও আছে, যাহার কর্ম্মিণীরা অখণ্ড-মণ্ডলীর সহিত সম্যক্ মৈত্রীভাব রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর অনুপূরক প্রতিষ্ঠান রূপে সংঘের কাজ করিয়া যাইতেছেন। কোথাও কোথাও অখণ্ড-মণ্ডলীরই অন্তর্ভুক্ত একটী মহিলা বিভাগ আছে এবং এই বিভাগের কর্ম্মিণীরা পৃথক্ ভাবে মহিলাদের মধ্যে সংগঠন-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। এই সকল স্থলে মণ্ডলীর পুরুষ-কর্ম্মীদের পক্ষে মহিলা-কর্ম্মীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নহে।

মহিলা-কর্ম্মীদিগকে তোমরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিও। তাঁহাদিগকে তোমরা সম্ভ্রমের সহিত স্বীকার করিও। তাহাদের দ্বারা সংগঠনের যে যে কাজ হইতে পারে, তাহা তোমরা করাইয়া লইও। অন্তর্মুখ-প্রয়াসে তাঁহারা যাহাতে নারী-সমাজের মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়া যাইতে পারেন, তাহার জন্য তোমরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা ও সহায়তা দিও। তাঁহাদের এভাবে কাজ করিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে। তাঁহাদের কাজ করিবার উদ্যমকে অনাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করিও না। তোমরা যখন সমাজের বাহিরের অংশটায় ব্যস্ত থাকিবে, তাঁহারা তখন প্রবেশ করুন সমাজের অন্তঃপুরে এবং অন্তর-পুরে। তোমরা তাঁহাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করিও না।

যে সকল মহিলারা পুরুষদের মধ্যে গিয়া কাজ করিতে

অসুবিধা বা অরুচি বোধ করেন, তোমরা জোর করিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষদের মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য করিও না। একই মহৎকর্ম্মের দুই দিক তোমরা দুই দলে করিতেছ, এই কথাটী মনে রাখিও।

মহিলা-কর্ম্মীদের সম্পর্কেও এই একটী কথা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য যে, তাঁহারা যেন, অখণ্ড-মণ্ডলীর শক্তি-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন, নিজেদের অহংপ্রমত্ত কোনও ত্রুটির দ্বারা মণ্ডলীর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট না করেন। মণ্ডলীর সহিত বিরোধ করিয়া কোনও কাজ তাঁহাদের করা উচিত নহে, কেননা তাহা দ্বারা নিত্য-কলহের সৃষ্টি হইবে। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব বলিতেন,—"নিত্যকলহ মহাযুদ্ধ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।" আমার পরমপূজনীয় পিতামহদেব বলিতেন,—"তূষের অনল শ্মশানাগ্নির চেয়েও অধিক ক্লেশপ্রদ।" তোমরা নিত্য-কলহ রূপ তূষানল হইতে সর্ব্বদা নিজেদের রক্ষা করিয়া চলিও।

মণ্ডলীর কোনও পুরুষ-কর্ম্মীর মহিলা-কর্ম্মীদের প্রতি আক্রোশ-ভাব নিয়া চলা উচিত নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও পক্ষেই পরকীর্ত্তিতে অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে। তোমাদের একটী ভ্রাতা বা ভগিনী নিজের একনিষ্ঠ-জনসেবার ফলে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলে তোমাদেরই গৌরব। ইহাতে তোমাদের দুঃখিত হইবার কারণটা যে কি হইতে পারে, আমি বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না।





যে গ্রামে বা সহরে অখণ্ড-মণ্ডলী থাকিবে, সেখানে এই মণ্ডলীই তোমাদের মূল প্রতিষ্ঠান। ইহার সহিত অবিরোধ ভাব রাখিয়া চলিলেই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট করা হইল না, এই মণ্ডলীকে তোমাদের প্রতি দিনের চিন্তা, বাক্য এবং কর্ম্মের মহিমায় শক্তিশালিনী প্রতিষ্ঠাপন্না, সমৃদ্ধিযুক্তা করিয়া তুলিতে হইবে। কলহ যদি বর্জ্জন না করিতে পার, তাহা হইলে এই মহনীয় কৃতিত্ব তোমরা কদাচ প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

মণ্ডলী তোমার গুরু-বিগ্রহ। এখানে তুমি নম্র হইবে না ত' কোথায় হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক<br>**স্বরূপানন্দ**

## (৫২)

**হরিওঁ**

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী<br>২৫শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৭২<br>১১-১১-৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বড়ই দোদুল্যমান চিত্ত লইয়া পুপুন্কীতে আসিয়াছিলাম যে, শরীর কাজ করিতে পারিবে কিনা। কিন্তু কাজের সম্মুখে আসিয়া শরীর তাহার সকল দ্বিধা নিমেষে পরিহার করিল।

স্থানীয় তিনজন রাজমিস্ত্রী এবং বারাণসী হইতে আগত তিনজন, এই ছয়জনে ঝড়ের গতিতে ইট গাঁথিয়া চলিয়াছে। যদিও ইটের চিমনি ভাটা এবার খুলিতে পরিলাম না কিন্তু বাংলা ভাটায় তৈরী যে পাঁচ লক্ষ ইট এখন হাতের মুঠায় আছে, তাহা অল্প সময় মধ্যে গাঁথিয়া ফেলাও তুচ্ছ কাজ নহে। এদিকে ধান কাটার সময় আসিয়া গিয়াছে। কুলী-মজুর দুর্ঘট। কিন্তু আশ্রমকর্ম্মী নিতাই, বিষ্ণু, হরিষ, শান্তি, বিনয়, পুলিন, কিরণ, সমর্পণ, অঞ্জন, সাধনা ও আমি কি বসিয়া থাকিব? সাধনা কোনও কাজে দুচার দিনের জন্য কলিকাতা গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই পুনঃ কাজে লাগিবে। এ আশ্রমের জন্য সাধনা বাংলা ১৩৩৮ সাল হইতেই অল্পাধিক শ্রম দিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান কর্ম্মীদের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে পুরাতন। শ্রম আমাদের ভাল লাগে, শ্রম করি। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে এই শ্রম তোমাদেরই জন্য। এই জন্যই শ্রমে আমার এত আনন্দ। শরীর এখন শ্রমে পটু নহে। কিন্তু মনের পটুত্ব কে অপহরণ করিবে? মন দিয়াই মানুষ বিশ্ব-বিজয় করে। শরীর ত' তাহার ভৃত্য মাত্র। তোমরা তোমাদের মধ্যে বিশ্ব বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা কখনও অনুভব করিয়াছ কি? যে ইহা অনুভব করে নাই, সে কখনও বুঝিবে না যে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে সমগ্র দেহমনে কি আনন্দ-শিহরণ জাগে। তোমাদিগকে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন কেহ দেখাইতে পারিল না বলিয়াই সমগ্র জাতির দেহমনে যে ভীরুতা, ক্লীবতা,





কাপুরুষতা চিরস্থায়ী বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহা এক ঝাঁকানিতে শতযোজন দূরে ছুড়িয়া ফেলিবার সাহস, উৎসাহ, উদ্যম তোমাদের আসিল না। আত্মশ্লাঘাকারী জাতিবঞ্চকেরা সমগ্র জাতির সম্পদ অনায়াসে অপব্যয়িত করিয়া নিজেদের কীর্ত্তিকে বিশ্বের বুকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য কতকগুলি কণ্ঠস্থ-করা বড় বড় বুলি উচ্চারণ করিয়া কেবল ধোঁকা দিয়া গেল, আর, তোমরা চিতাভস্মের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নিজ নিজ শ্মশানাগ্নির কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছ। আত্মপ্রচারে বিব্রত এই সকল বহুজনমান্য নেতাদের ফরমূলায় আমার বিশ্বাস নাই। আমি শ্রম করিব তোমাদিগকে শ্রম শিখাইবার জন্য,—তোমাদিগকে শ্রম শিখাইব মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে সত্য সত্য দেবজাতি রূপে আত্মপ্রকাশের সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য। এই জন্যই আমি ধনীর দানকে এবং রাজকীয় অনুগ্রহকে সমভাবে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। আমি শ্রম করি, তোমাদের জন্য ইহাই আমার আনন্দ। আমি যদি আমার কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার জন্য শ্রম করিতাম, তাহা হইলে কদাচ এই সুপবিত্র, সুনির্ম্মল, সুস্নিগ্ধ, সুস্মিত, স্বচ্ছন্দ আনন্দের রসাস্বাদন করিতে পারিতাম না। আনন্দ আমার আলস্য হরণ করিয়াছে, আনন্দ আমার জীর্ণ শরীরে নবামৃত রসায়নের সঞ্চার করিয়াছে। আমি শুনিতে চাহি, কে তোমাদের মধ্যে এ মহানন্দ-রসায়নের সুখাস্বাদ গ্রহণের জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছ? তাহারা বিলম্ব না করিয়া অগৌণে আত্মপ্রকাশ কর, আত্মপরিচয় দাও।

আত্মার উদ্ধারে আত্মাকেই করিতে হইবে উৎসর্গ। উৎসর্গ সেখানেই সার্থক, যেখানে নিজের স্বার্থের চিন্তা নাই, পৃথিবীর সকল লোক হইতে আলাদা করিয়া নিজের আত্মীয়-পরিজনের উন্নতিলাভের দিকে পক্ষপাতদুষ্ট কুদৃষ্টি যেখানে নাই, সকল মানুষের প্রতি সমত্ব দেখাইবার জন্য অকারণে আত্মজনকে উৎপীড়িত করিবার মানসিক দুর্ব্বলতা বা বাহাদুরীবুদ্ধি যেখানে নাই। এস আমরা প্রত্যেকে এই সঙ্কল্পই করি, জীবন আমরা উৎসর্গই করিব কিন্তু কীর্ত্তিলোভে এই উৎসর্গকে আত্মজনপীড়ন বা স্বার্থলোভে আত্মীয়-পোষণে নিয়োগ করিব না। বিগত আঠারো কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের উচ্ছন্ন-চরিত্র নেতৃজনেরা জাতির সেবার নাম করিয়া যেভাবে আত্মঘাত করিয়াছেন, যদি জাতির ভিতরে নপুংসকতা প্রবল না হইত, তাহা হইলে এই অন্যায় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কত আগেই বিদ্রোহের দামামা বাজিয়া উঠিত। তোমরা সঙ্কল্প কর, দুর্নীতিকে, মিথ্যাচারকে কেবল ব্যক্তিগত জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই চলিবে না, তাহাকে সমস্ত জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ ক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহার জন্য যাহা চাই, তাহা কর্ম্ম।

কর্ম্মকে গর্হণ করিয়া অনেক ধর্ম্মনেতা মধুর উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু অপরের কর্ম্মফলাহৃতি সুমিষ্ট শর্করা





এবং সুপক্ক অন্নে ইহারা কদাচ অবহেলা করেন নাই। ব্রত উপবাসাদি দ্বারা আহার-সংযমের দৃষ্টান্ত ইঁহাদের জীবনে যথেষ্ট আছে কিন্তু সুপ্রাচীন বৈদিক ঋষি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, "অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্ ব্রতম্—প্রচুর অন্ন উৎপন্ন কর, ইহা তোমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য", সেই উপদেশের অনুসরণ করিয়া জনসাধারণকে অন্ন উৎপাদনে উৎসাহ দান করেন নাই। তাঁহাদের উপদেশের ফলে ভিক্ষাটনকারীর সংখ্যাই বাড়িয়াছে, অন্নোৎপাদনকারী বাড়ে নাই। বিচার করিয়া দেখ, ইহা জাতির পক্ষে শুভঙ্কর হইয়াছে কি না। আঠারো বৎসর হইল ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। চরকা কাটিয়া আর লবণ সত্যাগ্রহ করিয়া এই স্বাধীনতা তাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমতাধিকারী নেতারা মনে করেন বা কহিয়া থাকেন। কিন্তু এতগুলি বৎসরে ইঁহারা দেশের লোককে দিয়া প্রচুর অন্ন উৎপাদন করাইতে পারেন নাই। বড় বড় ধনবান দেশগুলির কাছে ভিক্ষাপাত্র হস্তে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া ইহারা ছুটিয়াছেন এবং আজ হঠাৎ বেকায়দায় পড়িয়া বলিতেছেন—"হে ভারতবাসী, প্রতি সোমবার তোমরা উপবাস কর।" পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী প্রভৃতির উপবাসে ইঁহাদের অধিকাংশের শ্রদ্ধা নাই। যে-সকল ধর্ম্মাচার্য্যেরা শিষ্যমাত্রকে মাসে তিন চারিটা করিয়া উপবাস করিতে বাধ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মতামতের প্রতি ইঁহাদের অধিকাংশেরই আস্থা নাই। আর, ইঁহারাই আজ বলিতেছেন,

—"সোমবার উপবাস কর।" সমগ্র জাতিকে অন্নার্জ্জনে দক্ষ করিয়া তুলিবার পরে যদি ইঁহারা বলিতেন যে, "শুধু সোমবার কেন, জাতির প্রয়োজনে সপ্তাহে তিন দিন করিয়া উপবাস কর", লোকে তাহাই শ্রদ্ধা সহকারে মানিয় চলিত। আজ অবশ্য কোনও স্থানের এক মুখ্যমন্ত্রী একসের কিস্‌মিস্ খাইয়া সেদিনকার মত তণ্ডুল অথবা গোধূম বর্জ্জন করিবেন, কাল হয়ত অন্য আর এক স্থানের আর একটি মুখ্যমন্ত্রী সোমবাসরে আলু এবং কাঁচকলা সিদ্ধ খাইয়া এক দিনের জন্য তণ্ডুল এবং গোধুম বর্জ্জন করিবেন কিন্তু এই সকল দৃষ্টান্ত যে সুদৃষ্টান্ত নহে, ইহা জনসাধারণের বুঝিতে বাকী থাকিবে না। আমিও একদা এই আশ্রমটিতে বসিয়া তণ্ডুলের অভাবে ঢেঁড়শ পাতা সিদ্ধ, পুঁইপাতা সিদ্ধ, মহুয়াফুল সিদ্ধ খাইয়া তনুরক্ষা করিয়াছি। কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসাবে এগুলি কিছুই নহে। এক পোয়া কাঁচকলা-সিদ্ধ যখন এক পোয়া তণ্ডুলের চাইতে স্বল্পতর মূল্যের হইবে এবং কাঁচকলা যখন সর্ব্বত্র সুলভ হইবে তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে কাঁচকলা-সিদ্ধ সেবন তখনই সুদৃষ্টান্ত হইবে! কর্ম্মের সময়ে কর্ম্ম করিব না, বাক্যের বান বহাইয়া দিয়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তিকে অতলে তলাইয়া দিব, তারপরে একদিন হঠাৎ একটা অপদৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিব—সবাই কাঁচকলা খাও, ইহার ফল কাঁচকলা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। দশ, বারো বা আঠারো বছরের পরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যাঁহারা কাজ করিতে পারেন





না, তাঁহাদের দিকে না তাকাইয়া তোমরা তিনশত বৎসরের পরের ভবিষ্যতের দিকে তাকাও এবং তাহার জন্য এখনি কর্ম্মোদ্যত হও। কর্ম্মই এখন বাঁচিবার পথ, বচন-বিলাস নহে। বাঁচিবার পথ জানিতে হইলে অনেক পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, —ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক বুদ্ধি তোমাকে সেই পথ বলিয়া দিতে পারিবে। পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুকের দল ভিক্ষালব্ধ ক্ষমতায় ভিখারি-জন-সুলভ বুদ্ধিতে কুপথ আশ্রয় করিয়া দেশের যে দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে, জাতির যে দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নিরাকরণ তোমাকে আমাকেই করিতে হইবে এবং করিব আমরা কর্ম্মের বলে। আমাদের বিশ্রামের অবসর কোথায়?

কর্ম্মও কর, সাধনও কর। প্রত্যেকে সাধনে আগ্রহী হও। সাধন-হীন ব্যক্তিদের সংঘ চরিত্রের অংশে বড়ই দুর্ব্বল হয়। সেই দুর্ব্বলতা মহাভারতের মুষল-পর্ব্ব সৃষ্টি করে। তোমরা সাধক হও, চরিত্রবান্ হও এবং সংঘবদ্ধ হও। যেখানে দশজনের মিলিবার পথে বিঘ্ন-কণ্টক আরোপিত হইয়াছে, সেখানে একাই কাজ করিয়া যাও। কাহারো প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিও না। বসিয়া থাকিবার জন্য আমরা একজনেও জন্মগ্রহণ করি নাই। যাহারই সঙ্গ করিবে, সে যেন সৎলোক হয়। সত্যই লিখিয়াছ, সৎসঙ্গ দুর্ল্লভ। কিন্তু বাবা, আমি যে সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছি, এই কথা ভুলিয়া যাইও না। নিমেষের জন্যও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি না। কামের বেগ প্রবল হইতে থাকিলে কাম

এবং কাম্যবস্তু উভয়ই মনে মনে আমাকে অর্পণ করিতে থাকিও। আমি সুকৌশলে তোমার সমস্ত মনোব্যাধি আরাম করিয়া দিব।

যেখানে সম্ভব, একটি করিয়া নূতন মণ্ডলী স্থাপন করিয়া যাও। এক একটি করিয়া অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপন করিতেছ, আর, ভারতের জাতীয় শক্তি বাড়াইতেছ, একথা মনে রাখিও। অনেক ধর্ম্মপ্রচারকই জাতিকে অতুলনীয় আধ্যাত্মিকতা দিয়াছেন কিন্তু তোমাদিগকে ইহার অতিরিক্ত দিতে হইবে মানুষ্যত্বের বীর্য্য-বহ্নি, সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্যতা এবং দর্জ্জয় সংগ্রামশীলতার সহিত দেবত্বের নবনীত-কোমলতা। Without your knowing it, you are gradually going to be an organisation of unprecedented programme with unique ways and unquestionable means. (তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমরা ধীরে ধীরে এমন একটী সংঘে পরিণত হইয়া যাইতেছ, যাহার কর্ম্মসূচী অভূতপূর্ব্ব, যাহার কর্ম্মধারা অসামান্য এবং যাহার কর্ম্মোপায় প্রশ্নাতীত।) তোমরা আমার শিষ্যই হইয়াছ কিন্তু আমাকে চিনিতে পার নাই। চিনিতে পারিলে তোমাদের ভৈরব-হুঙ্কারে মেদিনী প্রকম্পিত হইত। এই যুগে ভগবানকে ডাকিতে সংঘবদ্ধতা প্রয়োজন। যাহাদের সংঘবল নাই, কেবল ব্যক্তিগত উৎকর্ষে তাহারা পৃথিবীতে কোনও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু ঐক্যবলের সহিত ব্রহ্মবলও যুক্ত হওয়া চাই।





কথা বলা আর কাজ করা, এক কথা নহে। কথার ফল সকল সময় পাওয়া যায় না, কাজের ফল সর্ব্বদাই মিলে। তোমরা প্রত্যেকে কাজে হাত দাও। তোমরা যে বসিয়া নাই, আমি এই কথাটী শুনিতে চাই। তোমরা প্রত্যেকটী প্রতিবেশীর কাছে গিয়া দাঁড়াও। তাহার ভিতরে আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা জাগাইবার জন্য যাহা করা উচিত, তাহা কর। আমরা একটী সৎ-পাত্রকেও বাদ দিতে চাহি না। We must have each and all (প্রত্যেককে এবং সকলকে আমাদের চাই।) প্রত্যেককে দিয়া আমাদের প্রয়োজন। তুচ্ছ করিব না কাহাকেও। একজন পাদুকা-ব্যবসায়ীর খাতির যাহাদের সঙ্গে হয়, একজন শিক্ষাজীবির খাতির তাহাদের সঙ্গে নাও হইতে পারে। যাহাদের সহিত যাহার খাতির, সে তাহাদের ভিতরে কাজ কর। একজন চিত্র-শিল্পীর যাহাদের সহিত খাতির, একজন বীমা-কর্ম্মীর তাহাদের সহিত খাতির নাও জমিতে পারে। প্রত্যেকে তোমরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী পরিধিতে কাজ কর।

নিজের অন্ন নিজেরাই অর্জ্জন করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিবে, এই শিক্ষাটা প্রাচীন ভারতে ছিল, যদিও "ভবান্ ভিক্ষাং দেহি, ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া সামব্রহ্মচারী আশ্রমসমীপস্থ পল্লীতে যাইয়া ভিক্ষান্ন-সংগ্রহ করিত কিন্তু বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য আশ্রম প্রান্তে স্বহস্তে হলকর্ষণ করিয়া অন্নোৎপাদনে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আস্তে আস্তে আচার্য্যেরা হইলেন পরান্নভোজী

কুঁড়ের বাদশা। আর, শিষ্যেরা শিখিল গেরুয়া পরিয়া নগরে ও গ্রামে যাইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে। ভিক্ষান্নকে জীবনের চূড়ান্ত মহিমা বলিয়া বর্ণনা করা হইতে লাগিল। ধীমান্ এবং প্রতিভাশালী যুবকেরা দলে দলে যাইয়া মঠ ও বিহারের অন্নশালায় পংক্তি-ভোজনে বসিয়া গেলেন। শস্ত্রধারী নিষ্ঠুর বিধর্ম্মী আত্মকলহরত দেশকে তিন লাথি মারিয়া চির-পরাধীন করিয়া দিল।

এগুলি ঐতিহাসিক সত্য। স্বাধীন হইয়াও যে এখন পর্য্যন্ত এই কথাগুলি বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমরা নামে মাত্র স্বাধীন হইয়াছি। এই স্বাধীনতায় ক্ষুধার্ত্তের পেট ভরে না, দুর্ব্বলের বল জাগে না, নিদ্রিতের ঘুম ভাঙ্গে না, নীতি-কথা দ্বারা যেখানেই আমরা যেটুকু আত্মপ্রতারণা করিয়া থাকি না কেন, তাহার প্রতিরোধ এখনই করিতে হইবে এবং তাহার উপায় কর্ম্ম, সুকঠোর কর্ম্ম।

সকল বিচ্ছিন্নেরা এক হইয়া যাও। দূরে দূরে থাকিয়া কি লাভ? সকলের মিলনে যে শক্তি, যে আনন্দ, তাহা আর কোথায় পাইবে? মনে রাখিও, তোমাদিগকে মহাকার্য্য সাধন করিতে হইবে। দ্রুত সংবদ্ধ হও। ঐক্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া তোমরা তোমাদের অকল্পনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দাও। নিজেদের শক্তিকে mobilise (শৃঙ্খলাবদ্ধ ও গতিশীল) করার দিকে দাও প্রখর দৃষ্টি।





মণ্ডলীর বাতাবরণ সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবে। ইহার মধ্যে কাহারো ঔদ্ধত্য বা দ্রোহের স্থান নাই। বিনীত ও অনুগত চিত্ত লইয়া মণ্ডলীর সেবা করিবে। তবেই মণ্ডলীর সেবায় গুরু-সেবা হইবে। কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা, পরনিন্দা-প্রবৃত্তি এবং নিজের দোষ অপরের স্কন্ধে চাপাইবার অপকৌশল সংগঠনকে রুগ্ন, দুর্ব্বল এবং পূতিগন্ধময় করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**(৫৩)**

হরি-ওঁ মঙ্গলকুটীর

৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৭২

২২-১১-৬৫ ইং

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মতানৈক্য মতদ্বৈধ প্রভৃতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা মিটাইয়া ফেলিবার সামর্থ্যের ভিতরে যে অশেষ যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ আচরণে দিও। মানুষ যদি বিচারশীল হয়, তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিগত একটা মত থাকিবেই। আর, ব্যক্তিগত মত থাকিতে গেলেই অপরের মতের সহিত সংঘর্ষও ঘটিবেই। ইহা অনিবার্য্য। ইহা যেখানে ঘটে না, বলিতে হইবে সেখানে কতকগুলি বুদ্ধিহীন অন্ধ বাস





COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

করিতেছে। কিন্তু এক ব্যক্তির বিরুদ্ধ মতকে অপরাপর ব্যক্তির মতের সহিত সামঞ্জস্যে আনিয়া তাহাতে কার্য্যকর করিবার চেষ্টার ভিতরেই রহিয়াছে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তোমরা যদি এই কথাটি ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে কদাচ কোনও মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিবে না বা কোনও বহুজনহিতকর মঙ্গল-কার্য্যে সফল হইবে না।

সহস্র বিরোধের মধ্যে ঐক্য, ইহারই নাম সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে তোমাদের গঠন-কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। অন্ধকারের মধ্যেও আলোক আছে। ব্যাঘ্র বা বিড়াল তাই অমানিশিথিনীর গভীর তমিস্রাতেও তাহার লক্ষ্য বস্তু দেখিতে পায়। অনৈক্যের ভিতরেও ঐক্যের সম্ভাবনা আছে। তোমাদিগকেও তাহা দেখিতে হইবে, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

তুমি বা আমি যেই বিষয়ে যেই অভিমত পোষণ করিতেছি, অপর কেহ সেই বিষয়ে কোনও ভিন্ন মত পোষণ করিলে সাধারণ ক্ষেত্রে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবার তোমার বা আমার কোনও অধিকার নাই। আমাদিগকে তাহার ঐ ভিন্ন মতের পক্ষে কোনও সদ্‌যুক্তি এবং আলোচ্য প্রধান বিষয়ের সহিত ঐ বিরুদ্ধ-মতের কোনও সঙ্গতি আছে কি না, ইহা নিশ্চিতই দেখিতে হইেব। দেখিবার ভান করিলে চলিবে না, সত্য সত্যই তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কতগুলি যুক্তি বা অবস্থা থাকিতে





পারে, স্বল্প সময়ে যতটা সম্ভব তাহার বিচারও করিতে হইবে। তথাপি যদি দেখা যায়, এই মতানৈক্য কোনও বাস্তব যুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড়াইতেছে না, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, কি এমন বিশেষ কারণ ঘটিল, যাহার দরুণ একটী সাধারণ-বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণ সদ্‌যুক্তির পথে না গিয়া কুযুক্তি ও কুমীমাংসার আশ্রয় লইতে চাহিতেছে। এই কারণটীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে অনৈক্যের মূলোৎপাটন সম্ভব হইবে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব যেমন মনোবিকলনের রোগীকে নিরাময় করিবার জন্য ইহার পশ্চাতে গোপনে অবস্থিত অতি দূরের একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণকেও অনুসন্ধান করিবার জন্য অশেষ অধ্যবসায়ের যোজনা করে, তোমাকেও স্বমত-বিরোধীর মতবিরোধের আসল কারণটীকে সে-ভাবে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সে তাহার মতামতের স্বপক্ষে যেই সকল যুক্তি দিতেছে, তাহা হয়ত প্রকৃত যুক্তি না হইয়া কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট মীমাংসাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য after-thought বা পরবর্ত্তী চিন্তা হইতে পারে। কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়াই হয়ত বাগানের একটী গোলাপ ফুল ছিঁড়িয়াছি। কিন্তু যুক্তি দিবার সময় বলিয়া বসিলাম,—"ফুলটা পোকায় ধরিয়াছিল।" কেহ উহাতে পোকা খুঁজিয়া পাইল না, তবু বলিলাম,—"পোকা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" এইরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। যুক্তিটা পরে দেওয়া হইতেছে। সুতরাং সদ্‌যুক্তির




COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

রাস্তায় যেই রহস্যের নাগাল পাইলে না, এইরূপ যুক্তিপ্রদানের হেতু অন্বেষণের দ্বারা সেই রহস্যকে বাহির করিতে হইবে। মতে মিলিল না বলিয়াই হাতাহাতি করিব, ইহার কোনও অর্থ হয় না। অপরের মতের পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করিয়াই যতটুকু তাহার সহিত মতের মিল আছে, ততটুকু স্থলে আমরা পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করিতে পারি।

মতামতের পার্থক্য সসম্মানে স্বীকার্য্য হইলেও যেখানে আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া একটা মীমাংসায় আসিয়া পড়িয়াছি এবং কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য বিভিন্ন জনের মধ্যে কর্ম্ম-বণ্টন করিয়াছি, সেখানে আসিয়া মতভেদের ধ্বজা তুলিয়া যাহারা অগ্রগমনের পথ রুখিয়া দাঁড়াইবে, তাহাদের সহিত আপোষরফার কোনও প্রয়োজন নাই। সেখানে গায়ের জোরে নিজের পথে নিজে চলিবার সাহস এবং শৌর্য্য থাকা প্রয়োজন। সকল স্থানেই কতকগুলি কর্ম্মনাশা বাচাল থাকে, যাহারা টিপ্পনী কাটিয়া, বিদ্রূপ করিয়া, একজনের কথা আরেকজনের কানে প্রবেশ করাইয়া ষড়যন্ত্রপ্রিয়তার দ্বারা কর্ম্মোন্মুখ উদ্যত বাহুগুলিকে পথিমাঝে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহে। এমন ব্যক্তি যদি কোন সংঘের সভ্য হইয়া থাকে, তবে সেই সংঘের অকুশল অদূরে। ইহাদের সম্পর্কে ক্ষমাশীল হওয়ার মত ত্রুটি আর কিছুই নাই।

ধর্ম্মাচার্য্যেরা গুরুনিন্দককে অতীব হেয় দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমি আমার শিষ্যদের সম্পর্কে সকল আচার্য্যদের হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। কোনও শিষ্য আমাকে অনুপযুক্ত জ্ঞান





করিলে বর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে পারে,—এই স্বাধীনতা আমি দিয়াছি। কিন্তু গুরুদ্রোহী শিষ্য সংঘের মধ্যে থাকিয়া সংঘের ক্ষতি-সাধন করিতে থাকিলে নীরবে তোমরা তাহার প্রতি সমর্থন দেখাইবে এবং প্রশ্রয় দিবে, ইহা কদাচ হইতে পারে না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে কুপথচারীর মত-পার্থক্যকে সম্মান দিবার জন্য উদারতা-প্রদর্শন প্রকৃত উদারতা নহে শঠতা। আমি সুগভীর কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, সম্প্রতি ত্রিপুরার একটি নামী মণ্ডলী এই দোষে দুষ্ট হইবার দরুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, বরং ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে। কাছাড়ের একটী নামী মণ্ডলী আত্মকলহ করিয়া একেবারে অতলে তলাইয়া গেল, ইহা যেমন দুঃখদ সংবাদ, ত্রিপুরার একটা নামী মণ্ডলী তেমন ভাবে আত্মকলহ না করিয়াও সন্ধ্যাগগনের সূর্য্য হইল, ইহা অধিকতর শোচনীয়। দুর্গতির এই দুইটি ধারা হইতে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের মণ্ডলীকে বাঁচাইয়া চলিও। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা খুব বড় কথা। কিন্তু মানুষের সংঘবদ্ধ আদর্শবাদ, নিয়ম-শৃঙ্খলিত কর্ম্মচেষ্টা এবং যুগপৎ সর্ব্বসীমান্তে সমান বিক্রমে দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম-পরিচালনের দক্ষতা বাঁচিবার মত বাঁচিবার জন্য অত্যাবশ্যক। শৃগাল-কুক্কুরের মতন কোনও প্রকারে বাঁচিয়া আছ। এমন বাঁচার কোন লাভ নাই। পৃথিবীর বুকে স্ফীতবক্ষে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবার, চলিবার, জীবনযাপন করিবার অধিকার তোমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই অধিকার সংঘবল ব্যতীত কাহারো আসে না।

নিয়ত ঈশ্বর-পরায়ণ থাকিও। ভগবানে দেহ-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার সন্তানরূপে বিরাজ করিও, তাঁহার সেবক রূপে কাজ করিও। কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার যেমন কোনো অর্থ নাই, অহমিকায় উদ্ধত, আত্মম্ভরিতায় স্ফীত, পরপীড়নে ঘৃণিত দৈত্যদানবতুল্য পাশব জীবন ধারণেরও তেমন কোনো অর্থ নাই। জীবনের সার্থকতা তাহার পূর্ণতায় ও মাধুর্য্যে। পূর্ণ হও এবং মধুর হও। জীবনের সার্থকতা তাহার সত্যতায় এবং সৌন্দর্য্যে। সত্য হও এবং সুন্দর হও। সার্থক জীবন যাপন করিয়া মানুষ্য-সংজ্ঞাকে গৌরবান্বিত কর। ঈশ্বরাভিনিষ্ঠ চিত্ত লইয়া যে কাজে হাত দিবে, সে কাজই সহজ, সরল, সুন্দর ও সত্য হইবে। এই আসল কথাটী ভুলিয়া যাইয়া নকলের মোহে নিজেকে প্রতারিত হইতে দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

(৫৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৭২

(২৩-১১-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সহস্র অসুবিধার মধ্য দিয়াও তুমি তোমার গৃহে কয়েক





দিন ধরিয়া শারদীয় অখণ্ড-উৎসব করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। তুমি দীনাতিদীন দরিদ্র। তথাপি তোমার গৃহাঙ্গন প্রতিদিন শত শত ভক্তিমান নরনারীর কলকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে আনন্দ সহকারে যোগদান করিয়াছিল এবং প্রতিজনের হাতেই প্রতিজনের পাতেই আদরণীয় প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল, আধ্যাত্মিকতার শারদহিল্লোলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল,—এই সংবাদে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি দরিদ্র, আর তোমার গৃহে এমন ব্যাপার হইয়া গেল, ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। চিরকালের উপেক্ষিত এবং দীর্ঘকালের সংগোপিত প্রণব মহামন্ত্র আজ নিজের মহিমায় যুগধর্ম্মের অনুকূল বাতাবরণে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া ক্রমশঃ নিজেকে উত্তোলিত করিতেছেন, ইহা কোনও বিচিত্র ব্যাপার নহে। তুমি দরিদ্র হইতে পার কিন্তু পরমেশ্বর ত' দরিদ্র নহেন। এই জন্যই তোমার গৃহে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহাকে তোমাদের অঞ্চলের একটী জাতীয় উৎসব বলা যাইতে পারে।

"প্রতিধ্বনি"র এক ভক্তিমান পাঠক মাসেক পূর্ব্বে বারাণসী ঠিকানায় আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাস্য ছিল যে, শারদীয় অখণ্ড-উৎসবকে বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত করা যায় কি না। পত্রলেখক আমার শিষ্য নহেন কিন্তু আমার আদর্শের প্রতি অনুরক্ত। হাজার হাজার পত্র আসে।

সবগুলি পড়ারও অবসর হয় না, জবাব দেওয়া ত' দূরের কথা। এই পত্রখানা আলাদা করিয়া রাখিলাম। মনে করিলাম যে, পুপুন্‌কী আসিয়া জবাব দিব। জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইল। হুড়াহুড়ি করিয়া পুপুন্‌কী রওনা হইলাম। এখানে আসিয়া দেখি, পত্রখানা সঙ্গে আসে নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসু ভদ্রলোকের পত্রের উত্তরখানা তাঁহার ঠিকানায় লিখিয়া পাঠান সম্ভব হইল না। কিন্তু তোমার পত্রখানা আমাকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার সুযোগ দিয়াছে।

যাহারা নিজেদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যদি নিজ নিজ নিষ্ঠায় অবিচল থাকে, তাহা হইলে শুধু বাঙ্গালীর কেন, শারদীয়া প্রণবোপাসনা অখিল ভারতের তথা নিখিল জগতের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীন প্রথায় আড়ম্বর করিব, লোকের কাছে নাম বাড়াইবার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানে নিজেকে জড়াইব, অথচ অখণ্ড বলিয়া পরিচয় দিতে ছাড়িব না,—এই রীতি ও মনোবৃত্তির যদি অধীন না হও, তাহা হইলে শারদীয়া অখণ্ডোপাসনার পক্ষে সমগ্র ভারতব্যাপী জাতীয় উৎসবে পরিণত হইতে অধিক দিন লাগিবার কথা নহে। একজন সুরেন্দ্র ভাওয়াল তিনসুকিয়ার অখণ্ড উপাসনাকে এমন মর্য্যাদা দিয়াছে, যাহাতে ইহা ঐ অঞ্চলে একটা জাতীয় উৎসবে পরিণত হইতে চালিয়াছে। একজন হরিদাস দেব প্রথমে কুমিল্লার কাশীপুরে এবং বর্ত্তমানে ত্রিপুরার রাজধরনগরে শারদীয়





অখণ্ড-উপাসনাকে এমন মর্য্যাদা দিয়াছে, যাহাতে ঐ অঞ্চলে ইহা সর্ব্বসাধারণের উৎসব হইতে চলিয়াছে। জাতীয় সঙ্গীত যেমন ফরমাইশ দিয়া রচনা করা যায় না এবং বঙ্কিমচন্দ্র তথা রবীন্দ্রনাথের রচিত জাতীয় সঙ্গীতকে হঠাইয়া দিবার চেষ্টায় নামিয়া অনেক উর্দু এবং হিন্দী কবি যেমন নাজেহাল হইয়াছেন, জাতীয় উৎসব তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত্তিতে জন্মে, জোর করিয়া জাতীয় উৎসব সৃষ্টি করা যায় না। তোমাদের মতন দীন-দরিদ্রের ভিতরে যখন এমন একনিষ্ঠা জন্মিবে যে, পৃথিবীর সকল মন্ত্রকে এই একটী মাত্র মন্ত্রের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, সকল তত্ত্বকে এই একটি মাত্র তত্ত্বের ভিতরেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপলব্ধি করিবে, তখন দীন ভক্তের অকপট আর্ত্তির সম্মুখে দীনদয়াল পরমেশ্বর বিশ্বের সকলকে আনিয়া যুক্ত করাইয়া দিবেন। এই শরণাগতি জাতীয় উৎসবের সৃষ্টি করিবে, কোনও কৃত্রিম কৌশল নহে।

তোমাদের শারদীয়া অখণ্ডোপাসনা জাতীয় উৎসবে পরিণত হউক, এই জাতীয় চিন্তা দ্বারা আমি কদাচ পরিচালিত হই নাই। অখণ্ড উপাসনার মাধ্যমে জাতি হউক শক্তিশালী, বীর্য্যবান্ জাতি হউক ঐক্যবদ্ধ সুসংহত, জাতি হউক কর্ম্মোদ্যত এবং মরণভয়রহিত, ইহাই আমার কামনা। এই কামনা পূর্ণ হইলে (অথবা পূর্ণ হইবার পথে) শারদীয়া অখণ্ড উপাসনা জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়া যাইতে দেরী হইবার কথা নহে। যাহা হইবার, তাহা স্বভাবের পথেই হইবে। কৃত্রিম কৌশলের দ্বারা নহে।

তোমরা আত্মস্থ হও এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হও। দুর্ব্বলের উচ্চাশা দুরাশা মাত্র। সবলেরই উচ্চাশা ইতিহাস প্রণয়ন করে। তোমরা সবল হও, শক্তিমান হও। তোমরা বীর্য্যবান হও, ধৈর্য্যশীল হও, গৃহীত ব্রতে পরিনিষ্ঠিত হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**(৫৫)**

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর

১০ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৭২

(২৬-১১-৬৫)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এখন আমরা পুপুন্‌কীতে যুগপৎ দুইটী অতি কঠোর শ্রমজনক প্রয়োজনীয় কার্য্যে আত্মনিয়োজিত। সাধনা প্রাতে উঠিয়া ধান্যক্ষেত্রে যায়, আটির পর আটি ধানের গুচ্ছ গোযানে নিজ হাতে তোলে, সারাদিন মাঠেই পড়িয়া থাকে, কোনো কোনো দিন স্নান আসিয়া করে রাত্রি নয়টায় মঙ্গলঘাটে। মাঠেই বসিয়া খাবার খায়। একটী সাধারণ কুলী রমণীর সহিত এখন তাহার কোন পার্থক্য নাই। আর আমি? ভোরে উঠিয়াই ইটের পাঁজায় চাপি, আশ্রমের কর্ম্মীরা, যথা নিত্যসুন্দর, বিষ্ণুপদ, কিরণ, পুলিন, সমর্পণ, প্রেমাঞ্জন পাঁজার ইট জলে ভিজাইয়া নিয়া





গাঁথুনির স্থানে রাখে। এতদিন শান্তিময়ও ছিল, গত পরশু হইতে তাহাকে এক মোটর-মেরামতের কারখানায় শিক্ষার্থী রূপে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসিয়া একটী কর্ম্মীর অভাবে পড়িয়াছি। সারাদিন গাঁথুনির স্থানে থাকি, আহারও করি সেইখানে বসিয়া। এইরূপ ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে তোমাদের কাছে যদি জানা-কথা নূতন করিয়া ঝালাইবার জন্য পত্র লিখিতে হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা হয়। একখানা টেলিগ্রাম আসিলে পড়িবার সময় পাই না, আর তোমাকে জরুরী পত্র লিখিতে হইবে, সমবেত উপাসনার সর্ব্বজনীনতা রক্ষারজন্য অত্যাবশ্যকীয় চিরঘোষিত নীতি সম্পর্কে। ইহা কি বৃথা শ্রম নহে?

তুমি নাকি ধারণা করিয়াছ যে, সমবেত উপাসনার আমিই যখন প্রবর্ত্তক, তখন এই উপাসনাতে বিগ্রহের সহিত আমারও প্রতিচিত্র থাকা নিতান্তই উচিত। তুমি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, আমারই প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনাতে আমার প্রতিকৃতিকে রাখিবার ব্যবস্থায় যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে তুমি সেই উপসানায় কদাচ যোগ দিবে না।

তোমার এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং এই প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল। কেননা, সকলকে লইয়া যেখানে পরমেশ্বরের আরাধনা, সেখানে আমিও তোমাদের সমসাধক রূপে সম্মুখে রক্ষিত একটী বিশেষ আসনে কখনো স্থূলভাবে কখনো সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত রহিয়াছি। তোমরা কি আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনায় আমাকেই আমার প্রতিচিত্র পূজিতে বাধ্য করিতে চাহ? ইহা কি যুক্তি-সঙ্গত?

বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার ভক্তি অতীব প্রগাঢ় এবং আমার প্রতিচিত্রের পূজা করিতে তুমি আনন্দ পাও। কিন্তু সমবেত উপাসনার কালে এমন লোকেদেরও তোমাদের মধ্যে আসিয়া বসিতে হইতে পারে, যাহারা আমাকে বা আমার প্রতিচিত্রকে পূজার সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করে না। আমার প্রতিচিত্রটী বসাইয়া তোমরা কি এই সকল লোককে সমবেত উপাসনার পবিত্র আসর হইতে বাহিরে রাখিতে চাহ? বিশ্বের সকলকে তোমাদের সমবেত উপাসনায় টানিয়া আনিতে হইবে। ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়ের গণ্ডীগত বিচার নাই। এই উদারতা আমি সর্ব্বজীবের জন্য প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। তোমরা কি আমার প্রতি ভালবাসার ভানে ইহাদিগকে বুকের কাছে পাইবার ব্যপক অধিকারটুকু হারাইতে চাহ?

আরও একটী কথা আছে। তাহা এই যে, আমি গতানু-গতিকপন্থী আচার্য্য নহি। গড্ডলিকা-প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া "দেখি, স্রোতোজল আমাকে কোথায় কোন্‌দিকে কতদূর নিয়া যায়",—আমি সেই শ্রেণীর গুরু নহি। আমি অতীতের কাহারও অনুকরণও নহি, অনুসরণও নহি। অতীতের সমস্ত আচার্য্যদের সুমহৎ অবদানকে শ্রদ্ধা সহকারে শিরে ধারণ করিয়াও আমি আমার নিজস্বতার মহিমায় সমুজ্জ্বল। এই কথাটা যে আবার মুখ ফুটিয়া তোমাদিগকে খুলিয়া বলিতে হয়, ইহাতেই আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। প্রায় প্রত্যেক গুরুদেব শিষ্যকে গুরুর পূজা করিবার জন্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার সুফল





আছে, বিস্তর কুফলও আছে। সেই কুফলগুলি ভারতের জাতীয় জীবনকে দুর্ব্বল, পঙ্কিল, কলুষিত ও কবন্ধে পরিণত করিয়াছে, এই কুফল হইতে আমি জাতিকে মুক্ত করিতে চাহি। এই জন্যই আমি গতানুগতিকতার অনুসরণে সম্মত হই নাই। প্রতিষ্ঠাবান আচার্য্যেরা আমাকে অপছন্দ করিতে পারেন, কেহ কেহ ভয়ও পাইতে পারেন, আমি যে ধর্ম্মবিনাশী মতামত প্রচার করিয়া কালাপাহাড়ের কাজ করিয়া যাইতেছি, এইরূপ কটূক্তি দুই চারিজনে উচ্চারণও করিয়াছেন এবং কেহ কেহ আমার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিবার জন্য গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে মিথ্যা অপবাদ শুনাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ বিরুদ্ধতার সৃষ্টি করিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ দুগ্ধের সহিত বিষ মিশাইয়া দিয়াছেন, কেহ পদাঙ্গুষ্ঠে প্রণামের ছলে বিষাক্ত সূচিকা বিদ্ধ করিয়া প্রাণসংশয় অবস্থাও সৃষ্টি করিয়াছেন। এত সব সত্ত্বেও আমি আমিই রহিয়াছি, মেষপালের ন্যায় পালের গোদাদের পদানুসরণ করি নাই।

তোমরা কি এসব কথা জান না?

আমার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতে হইলে তোমাকে আগে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে জনহিতার্থে। একথা আমি "আমার মূর্ত্তিরে দিবি পূজা" এই সুদীর্ঘ কবিতা বহু বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি।

আমার প্রতিচিত্রে পূজার্পণ করিতে হইলে তাহা করিতে হইবে নিভৃতে এবং নিরালায়,—জনতার মাঝে নহে।

বিশ্বের সমস্ত জনতার মাঝখানে আমি সকলের সর্ব্বসামান্য একজন সঙ্গী। সেখানে আমার পূজার প্রয়োজন নাই। আমাকে পূজিয়া যদি কেহ লাভবান হইতে চাহে, তবে সে নিখিল বিশ্বের জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন একটী একক নিরালা মানুষ। তাহার পূজায় দশজনকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই।

দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব রূপে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিশ্বের সমস্ত জাতিকে লইয়া আমার অখণ্ড-উৎসবের পরিকল্পনা। আমি কি সেখানে পূজ্যের বেদীতে নিজেকে বসাইয়া এই উৎসবের বিশ্বব্যাপিত্ব সংহার করিতে পারি? সাধারণ যুক্তি-বিচারের দ্বারাই ত' এই প্রশ্নের উত্তর হইয়া যায়।

যে যাহার পূজক, সে তাহাই হইয়া যায়, একথা প্রসিদ্ধ। কিংবদন্তীর দিক্‌দিয়াও, উপলব্ধির দিক্ দিয়াও। আমি যাঁহার উপাসক, আমি তাহার সহিত অভিন্ন হইয়াছি, ইহা সত্য। ইহা ভানও নহে, অনুমানও নহে। আমি যাহা হইয়াছি, তাঁহারই পূজা হউক, ইহাই আমার কাম্য। অমি যাহা হইয়াছি, তোমরা প্রত্যেকে তাঁহাই হও ইহাই আমার শ্লাঘ্য। ইহা ছাড়া অন্য কোনও কামনা, অন্য কোনও শ্লাঘা আমার নাই। তোমরা শিষ্য, আমি গুরু। আমি যাহা চাহিতেছি, তোমরা তাহাই হও,—তোমরা যে যখন যাহা চাহিতেছ, আমাকে লইয়া তাহা করিতে যাইও না। সমবেত উপাসনায় আমার পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে





যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত তোমরা এমন একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে যে, আমি শনি, লক্ষ্মী, শীতলা আদির ন্যায় একটা তুচ্ছ জিনিষে পরিণত হইয়া যাইব।

ডিব্রুগড় হইতে এক ভক্ত বারাণসী আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাবামণি, আমরা সংখ্যায় যত, তাহাতে সকলে মিলিয়া আপনাকে যদি অবতার বলিয়া প্রচার করিতে থাকি, তাহা হইলে কেন আমাদের মতবাদ জনসমাজে প্রতিষ্ঠা পাইবে না?" আমি বলিয়াছিলাম,—তোমার প্রদত্ত যুক্তি সত্য কিন্তু আমি চাহি বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীকে নিজ নিজ অবতারত্ব উপলব্ধি করাইতে। সেই অবস্থায় আমি ইহাদের সকল হইতে আলাদা হইয়া একটী অবতার রূপে পূজিত হইলে, আমি যাহা, তাহা হইতে অনেক ছোট হইয়া যাইব। আমি নিজেকে চিনিয়াছি, তোমরা আমাকে চিন নাই। তোমরা কি আমাকে আমা-অপেক্ষা ছোট করিয়া দিতে চাহ?

এদেশের মাটিরই এমন গুণ, যিনিই আসিয়া তোমাকে ভগবানের একটুখানি খবর দিলেন, তিনিই ভগবান্ হইয়া গিয়া মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইতে লাগিলেন। তিনি যাহা তোমাদিগকে দিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তোমরা গ্রহণ করিলে কি না, না কি, তাঁহার উপদেশকে জটিল, কুটিল, গ্রন্থিল করিয়া ব্যাখ্যার গুরুভারে অতলে তলাইয়া দিলে, ইহার কোনও হিসাব-নিকাশ হইল না। ধর্ম্ম যদি জাতিকে বলিষ্ঠ না করে,

নির্ভীক না করে, আগন্তুক বিপত্তির সম্মুখে যোগ্যভাবে দাঁড়াইবার জন্য দৃঢ়জানু না করে, ধর্ম্ম যদি অতীতের অবদানকে ভবিষ্যতের মহা-সৃষ্টি বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য ইহার অনুসরণকারীদের দুর্জ্জয় সাহসে উন্মাদিত না করে, তবে, সেই ধর্ম্মকে প্রচারের মধ্যে আমি কোনও সার্থকতা দেখি না। ধর্ম্ম যদি জাতিকে বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ এবং বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া তুলিবার জন্য ললাট-দেশে দিগ্বিজয়ের গৌরবটীকা পরাইয়া না দেয়, জানিও সেই ধর্ম্ম প্রচার করিতে আমি আসি নাই। সকলের সহিত নিবিড় ঐক্য সংস্থাপনের পথে আমি যাহাতে বাধার কণ্টক হইয়া না পড়ি, তাহারই জন্য আমার নির্দ্দেশ, সমবেত উপাসনাতে আমার মূর্ত্তির পূজা হইতে পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৫৬)

হরিওঁ

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রায় প্রতিজনেই আমাকে পত্রে লিখিয়াছ, তোমাদের মধ্যে কোন কলহ নাই। অথচ তোমাদের পারস্পরিক মতবিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য দুই স্থান হইতে দুইটী নামী মণ্ডলীর কর্ণধারদিগকে যাইতে হইল। বল দেখি, কলহ নাই বলিয়া





ভুল খবর আমাকে কেন দিয়াছিলে? সাপে যাহাকে কামড়াইয়াছে, সে কি বুঝিতে পারে, তাহার বিষ আছে কি নাই? বিষ এখনও রহিয়াছে বা নামিয়াছে, তাহা বিষবৈদ্যেরই বুঝিবার কথা।

যাহা হউক, অসমর্থিত এক খবরে জানিলাম, তোমাদের কলহ মিটিয়া গিয়াছে এবং তোমরা যেসকল প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতেও যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার চেষ্টাই লক্ষ্য করিলাম। ইহাতে খুশী হইয়াছি।

কেহ কেহ মনে করিয়াছে যে, তোমাদের কলহ নিজ নিজ অত্যুগ্র সম্মানবোধ হেতু। তুমি নিজেকে যতটা গৌরবী বলিয়া মনে কর, আমি যদি কার্য্য-কলাপ বিচার করিয়া তোমাকে ততটা গৌরবান্বিত বলিয়া ভাবিতে না পারি, তোমার ত' মনে দুঃখ হইবেই, ক্রোধও হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, একজনের কৃতকার্য্যতায় এবং জনপ্রশংসায় অপরে ঈর্ষ্যান্বিত হওয়াতে এই কলহ বাধিয়াছে এবং অপরের যশকে খাটো করিয়া দিবার চেষ্টা হইতে কলহের ব্যাপকতা বাড়িয়াছে।

একের কৃতিত্বে অপরের ঈর্ষ্যান্বিত না হইয়া প্রকৃত কর্ম্ম এবং প্রকৃত সেবা দ্বারা নিজের কৃতিত্বকে বাড়াইবার চেষ্টা করাই তোমাদের পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। কেন না, তোমরা একটা মহান্ সঙ্ঘের সেবক ও সেবিকা। তোমাদের একজনের কৃতিত্ব সকলেরই কৃতিত্ব বলিয়া জানিও। তোমাদের একজনের গৌরবকে সকলেরই গৌরব বলিয়া ভাবিও। তোমাদের

একজনের চেষ্টার সহিত সকলের চেষ্টা সংযুক্ত হউক। ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে বাঞ্ছনীয়।

তোমাদের সম্মুখে একটা বিরাট কাজ আসিতেছে, যাহার খবর তোমাদিগকে এখনও খুলিয়া বলি নাই। যখন দেখিব, তোমরা একতার বলে বলীয়ান হইয়াছ, তখন কথাটা তোমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিব। তোমাদের ভিতরে ঐক্য স্থাপিত হইলে তোমরা যাহা করিতে পার, তাহার অধিক বলসাধ্য কোনও কিছু আমি তোমাদের চাহিতেছি না। কিন্তু যেইটুকু তোমাদের কাছে আমার প্রত্যাশা, তাহা যদি তোমরা সম্ভব করিতে পার, তাহা হইলে পঞ্চাশ মাইল স্থানের ভিতরে যতগুলি মানুষ বাস করে, তাহাদের প্রত্যেকে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে। তোমাদের যাহা ধন আছে, তাহার বেশী ধনে প্রয়োজন নাই। তোমাদের যাহা জন আছে, তাহার অধিক জনবল আবশ্যক নহে। তোমাদের যেটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহার অধিক বিদ্যাবুদ্ধির দরকার পড়িবে না। যাহা তোমাদের আছে, মাত্র তাহা দিয়াই তোমরা এক অসাধ্য সাধন করিতে পার। প্রয়োজন মাত্র একতার, একপ্রাণতার, সকলের সমভাবে কর্ম্মরত হওয়ার এবং প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের প্রেমবিস্তারের। যে সহকর্ম্মীকে দ্বেষ করিয়াছ, তাহাকে এখন প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। যাহাকে দিয়াছ ঈর্ষ্যা, তাহাকে দিতে হইবে ভালবাসা। যেই ব্যক্তি কাজ করিবার সময়ে হাত গুটাইয়া দূরে সরিয়া গিয়া কেবল কামনা করিয়াছ—"বিফল হউক, বিফল





হউক," তাহাকে কাজে লাগিতে দেখিলে ছুটিয়া গিয়া হাতে হাত মিলাইয়া, কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া নিজেরও কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। অভাবনীয় সাফল্য লাভের ইহাই গূঢ় কৌশল। ইহা ছাড়া আর কোনও অভিনব কৌশলের রহস্য-সন্ধান করিতে হইবে না।

দোষি-নির্দ্দোষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে আমার পত্র খানা পড়িও এবং পরস্পরের প্রতি বাচাল উক্তি এবং মুখর আলোচনা স্তব্ধ করিয়া দিয়া কর্ম্মরণাঙ্গনে বীরবিক্রমে নামিয়া পড়। মণ্ডলী গড়িয়াছ একতা সাধনের জন্যে, কলহ করিবার জন্য নয়। কলহ দুর্ব্বলের স্বভাব, একতা সবলতা দেয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

## (৫৭)

হরিওঁ ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি চলিয়া যাইবার পর তোমার রিপ্লাই কার্ডখানা আমার হস্তগত হইল। আমি পুপুন্‌কীতে কি ব্যস্ত আছি, নিশ্চয়ই দেখিয়া গিয়াছ। শক্ত অসুখ হইতে উঠিয়াছি এবং এখনও শরীর পূর্ণ সক্ষম হয় নাই। অপরে হইলে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় বিশ্রাম লইত। কিন্তু আমি তাহা নিতে পারি নাই। দেশ ও সমাজের প্রতি

কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে বিশ্রাম নিতে দিতেছে না। তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছ, আমি ও সাধনা প্রাতঃস্নান করিবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত পাই নাই এবং কাজ দেখিতে দেখিতে মাঠে বসিয়াই আহার করিতেছি। এইরূপ ব্যস্ততার মধ্যে পুপুন্‌কীতে কেহ আসিলে আমরা তাহাদিগকে দুইটী মুখের কথা বলিয়াও ভদ্রতা দেখাইতে পারি না। খাইতে পার, বেড়াইতে পার, ঘুমাইতে পার, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার না, ইহাই এখানকার অবস্থা।

অমনিও আমি কাজের সময় এবং কাজের স্থানে মনুষ্য-সমাগম পছন্দ করি না।

সুতরাং তুমি হয়ত মনে করিয়াছ, বাবামণি অনাদর করিলেন কিন্তু তোমার সহিত কথা কহিতে বসিলে ইটের পাজা হইতে ইট নামাইবে কে? এতগুলি কুলীমজুর খাটাইবে কে? বলিবে, সহকর্ম্মীরা আছেন। তাঁহারা শ্রম নিশ্চিতই করেন কিন্তু হাতে পায়ে করিলেই ত' হয় না মা, মস্তিষ্কেরও ত' চালনা চাই। যোদ্ধার বল কেবলই তাহার বন্দুকে নহে, কেবলই তাহার বাহুতে নহে, কেবলই তাহার সাহসে নহে, তাহার আসল বল তাহার মস্তিষ্কে। কেবল গুলি ছুড়িলেই শত্রু-হনন সম্ভব হয় না, স্থির লক্ষ্যে, স্থির মস্তিষ্কে এ কাজটী করিতে হয়।

সুতরাং আমি সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিলে তোমাদিগকে এইরূপ একটি "জেনারেল" পাইতে দীর্ঘসময় প্রতীক্ষা করিতে হইতে পারে। তাই, আমি না খাটিয়া পারি না।





তুমি যেই প্রশ্নটী লইয়া আসিয়াছিলে, তাহার মীমাংসা পত্র দ্বারাও হইতে পারিত। তোমরা মণ্ডলীতে গিয়া উপাসনার নাম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কলহের অশান্তি লইয়া ঘরে ফের, এমতাবস্থায় তোমাদিগকে সমবেত উপাসনায় যাইতে নিষেধ করা ছাড়া আমার আর কি উপায় ছিল? এখন যখন স্থির করিয়াছ যে, ঝগড়া-কলহ যে যাহাই করুক, তুমি তোমার সমবেত উপাসনা কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন তোমাকে মণ্ডলীতে যাইয়া সমবেত উপাসনা করিতে অনুমোদন কেন দিব না? নিজ নিজ পুষ্প-বিল্বদল লইয়া ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় উপাসনা-স্থলে উপস্থিত হইবে এবং উপাসনান্তে অঞ্জলিটী দিয়া বিনা বিতর্কে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিবে, এই নিয়মটী কর।

প্রসাদ বিতরণ এবং প্রসাদ গ্রহণ উপাসনার মুখ্য অঙ্গ নহে। ভোগ-নৈবেদ্য ব্যতীতও সমবেত উপাসনা হইতে পারে। কাহারো বাড়ীতে গুরুতর ঠেকা বা বিপদ থাকিলে সে অঞ্জলি দিবার পরক্ষণে প্রসাদ না লইয়া যদি ঘরে চলিয়া যায়, তবে উপাসনার কোনও অঙ্গহানি হয় না। সমবেত উপাসনার পরে প্রসাদ বিতরণের পদ্ধতির বিশৃঙ্খলার দরুন অথবা প্রসাদ বিতরণের পূর্ব্বে কোনও অবাঞ্ছনীয় তর্কাতর্কি এবং চটাচটি প্রভৃতি হইলে তাহা হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার জন্য যদি প্রসাদ না লইয়া কেহ গৃহে চলিয়া যায়, তাহাতেও উপাসনার অসম্মান হয় না। কিন্তু উপাসনার পরে যদি কেহ উপাসনার আসরকে ঝগড়া কলহের রণক্ষেত্রে কিংবা তাস-পাশা-দাবা

খেলার আড্ডায় পরিণত করে অথবা গান, বাজনা, ম্যাজিক ও নৃত্যাদির মজলিশে রূপান্তরিত করে, তবে উপাসনার অসম্মান হয়। উপাসনার পর যদি উপাসক ও উপাসিকারা শান্ত চিত্তটী লইয়া ঘরে ফিরিতে পারে, তবেই উপাসনা সার্থক হইল।

তোমরা বারংবার শুনিয়াছ যে, তোমাদের মণ্ডলী ও গুরু-বিগ্রহ অভিন্ন। "মায়ের কোলে ছোট শিশু কী হাগে না", এই যুক্তিতে তোমরা তর্কাতর্কি, দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বি, ঈর্ষ্যাঈর্ষ্যি করিয়া কি মণ্ডলীরূপ গুরু-বিগ্রহের গায়ে থুথু ফেলিবে? এই অপকার্য্য হইতে প্রত্যেকে যাহাতে বিরত থাকে, তদ্বিষয়ে তোমরা প্রত্যেকে সতর্ক থাকিও।

আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে না লিখিয়া পারিতেছি না। কোনও স্থানের এক মণ্ডলীর বিশিষ্ট একজন নেতৃ-পুরুষ তাহার বৃদ্ধ পিতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ার অপবাদ রটনা হইয়াছিল, যদিও এই অপবাদ আমি বিশ্বাস করি নাই। এই অপবাদে যদি এক কণাও সত্য থাকে, তবে একজন অখণ্ডের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ অল্পই আছে। অন্যত্র আর একটী মণ্ডলীর এক বিচক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তা তাহার মাকে নাকি খাইতে দিত না। ইহা সত্য হইয়া থাকিলে ইহার তুল্য অপরাধও আর কিছু দেখি না। তোমাদের মণ্ডলীতে শুনিতেছি, জনৈক বিশিষ্ট সভ্য তাহার জ্যেষ্ঠাগ্রজকে পাদুকা লইয়া মারিতে উঠিয়াছিল। একজন অখণ্ডের পক্ষে ইহার চাইতে নীচতা আর কি হইতে পারে। অন্যত্র এক মণ্ডলীর সভ্যকে দেখা গিয়াছে অর্থবান





গুরুভ্রাতাকে প্রতারিত করিয়া রাস্তার ভিখারীতে পরিণত করিতে। ইহাই যদি অখণ্ডদের আচরণ হয়, তাহা হইলে তোমরা আমার শিষ্য হইয়া, আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি লাভ লভিলে? আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, এই সকল অন্যায়কে তোমরা যদি নিজ চরিত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে না পার, তাহা হইলে নিজেদিগকে কোথাও অখণ্ড বলিয়া পরিচিত করিও না।

অবশ্য সকল অখণ্ডই এরূপ নহে। এমন অনেক অখণ্ড আছে, যাহারা সপ্তাহে তিন দিন না খাইয়া অপরকে খাওয়ায়, যাহারা নিজ নিজ সন্তানের মুখের দুধ কাড়িয়া আনিয়া অপরের ছেলেকে পান করায়, যাহারা পিতৃ-মাতৃ ভক্তির জন্য, পিতৃ-মাতৃ সেবার জন্য সর্ব্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়, যাহারা গুরুভ্রাতা বা ভগিনীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দানে প্রস্তুত, যাহারা অনাচার ব্যভিচারের পথে যাওয়া ত' দূরের কথা, নিজেদের দাম্পত্য জীবনে পর্য্যন্ত বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া অটল সংযমে ব্রতী। উপরে যে সকল কুদৃষ্টান্তের কথা বলা হইল, এগুলি ব্যতিক্রম-স্থল। কিন্তু এই সকল ব্যতিক্রম-স্থলীয় দুর্ব্বৃত্তেরা নিজেদের পাষণ্ডতা দ্বারা সংঘের সুনাম এবং সবলতা সেইভাবেই নষ্ট করিয়া থাকে, যেভাবে একবিন্দু গোমূত্র দশমণ দুধের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই জন্যই এই সকল ব্যতিক্রম-স্থলীয় পাপিষ্ঠদের আচরণের পরিবর্ত্তনের জন্য সমগ্র অখণ্ড-সমাজের প্রত্যেকটী পুরুষ ও নারীর প্রাণপণে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।

তোমাদের মধ্যে যাহারা মহাপ্রাণ রহিয়াছ, তাহাদের সম্পর্কে বলিবার কিছুই নাই। তাহারা নিজেদের মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে আরও দশ জনকে মহৎ করিবে কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা পাতকী রহিয়াছে, তাহারা যাহাতে সমগ্র সমাজকে নিন্দিত ও কলুষিত করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

আমি সেই দিকে তাকাইয়াই প্রত্যেকটী অক্ষর লিখিতেছি। আমাকে ভুল বুঝিও না মা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
**স্বরূপানন্দ**

**(৫৮)**

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
রবিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২
২৮/১১/৬৫
প্রাতে ৬টা।

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

লামডিং কন্‌ফারেন্‌স হইতে প্রাণভরা প্রেরণা নিয়া ঘরে ফিরিয়াছ এবং স্বস্থানে পৌছিয়াই সকলের ভিতরে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছ, এ সংবাদে বড়ই সুখী হইলাম। অনেকেই কংগ্রেস কন্‌ফারেন্‌স আদিতে যায় বক্তৃতা দিবার জন্য ও বক্তৃতা শুনিবার জন্য,—কাজ করিবার জন্য নহে। বক্তৃতাদানে যশোলাভ হয়, বক্তৃতা-শ্রবণে অনেক সময়ে জ্ঞান-লাভও হয়। কিন্তু বচনের





প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কর্ম্ম, তাহা অবহেলিত হয়। বৃথা সম্মেলন তোমরা কদাচ করিও না। বৃথা বক্তৃতা দিও না, বৃথা বক্তৃতা শুনিও না। বক্তৃতাদান অনেকের পক্ষে একটা রোগ-বিশেষে দাঁড়াইয়া যায়। বক্তৃতা-শ্রবণও অনেকের পক্ষে ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। বলা মাত্রই সার, আর শোনা মাত্রই সার, আর ঘরে ফিরিয়া অলস-নয়নে নিদ্রামগ্ন হওয়া সারাৎসার। তোমরা এই সকল বক্তৃতা-বিলাসে আর শ্রবণ-বিলাসে কদাচ মত্ত হইও না। কখনো এই সকলের প্রশ্রয় দিও না। কেহ যদি কাজের কথা কহিয়াছে, আর, তুমি যদি তাহা শুনিয়াছ, তবে এখন মাত্র কর্ত্তব্য, একমাত্র কাজ করার, অন্য কিছুর নহে। যে যতটুকু পার, কাজ কর। সবাই সমান কাজ করিতে পারে না, কিংবা সকলের সমান সুযোগও হয় না। কিন্তু সামর্থ্য কম বা সুযোগ কম, এই কুযুক্তির আশ্রয় নিয়া যাহারা ঘরেই বসিয়া থাকিবে, তাহারা যেন কখনও কোন সম্মেলনে না যায়। এই সকল নিষ্কর্ম্মা লোক সংঘের শত্রু, প্রতিষ্ঠানের বোঝা, সম্প্রদায়ের কলঙ্ক এবং জাতির দুষ্ট ব্রণ। যেকোন সম্মেলন হইবার পরে এই সকল নিষ্কর্ম্মা বচন-বিলাসী মানুষগুলিকে প্রত্যেকের খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন এবং একমাত্র বচনের বাহারে ইহারা সকলের মধ্যে যে কৌলিন্য, যে সম্ভ্রম, যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিয়া যাইতেছিল, তাহা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করা প্রয়োজন। একজন খুব ভাল ভাল কথা কহিতে পারেন বলিয়াই তাঁহাকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া অভিষেক করিতে হইবে, ইহার কোনও

অর্থ নাই। বক্তা বা শ্রোতা যে যখনি যেই সম্মেলনে যোগদান করিতে যাউক, ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ করিতে হইবে। কাজের নিরীক্ষায় মানুষের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, বচন-চাপল্যের মাধুর্য্য বা কবিত্বের ঝঙ্কৃতি দ্বারা নহে। এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিতে যদি না পার, তাহা হইলে তোমাদের সংঘ একটা বাচালের সংঘে পরিণত হইবে।

ঘরে ফিরিয়া লোকের মধ্যে কাজ করিতে সুরু করিয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। এই সম্পর্কে আমার বিশেষ বক্তব্য রহিয়াছে। কাজ করিতে হইলে ধনি-দরিদ্রের বিচার-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে, জ্ঞানী বা মূর্খের পার্থক্যবোধ মন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে, ছোট-বড় সকলের মধ্যে কাজ করা চাই। কাজ করিতে করিতে দেখিতে পাইবে, অনেক ক্ষেত্রে মূর্খ এবং দরিদ্রেরাই সকল সৎকার্য্যে অন্তরের গভীরতর আবেগ অনুভব করে। হয়ত দেখিতে পাইবে, ধনী এবং বিদ্বান লোকদের দম্ভের প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার অভিযান কণামাত্র অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। হয়ত দেখিবে, আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন এই সকল মহান ব্যক্তিরা, অপরে আসিয়া নিজ আত্মসম্মান খোয়াইয়া পদতলে নত না হইলে, কাহারও কথাই কানে তুলিবে না। এই সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধরিয়া কাল-প্রতীক্ষা কর প্রকৃষ্ট সুযোগের অপেক্ষায় থাক কিন্তু আত্মসম্মান খর্ব্ব করিয়া বড়মানুষদের কাছে হেয় হইতে যাইও না। তোমার লক্ষ্য মহৎ কর্ম্ম। তাহার জন্য





চাই সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ। দরিদ্র এবং সামান্য ব্যক্তিরাই পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশী। তুমি দ্বিধাহীন চিত্তে এবং অদুর্ব্বল মনে আত্মপ্রত্যয় সহকারে তাহাদের প্রতিজনের কাছে যাও। তোমার অন্তরে যদি থাকে অফুরন্ত প্রেম, সুনিশ্চিতই তুমি কার্য্যসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

তোমাদের অবহেলার দরুণ তোমাদের কোটি কোটি ভাইবোন তোমাদের কাছে-ভিতে থাকিয়াও তোমাদের অপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের কাছে তোমরা যাও নাই। স্নেহভরে ডাকিয়া ইহাদিগকে নিকট কর নাই, আপন কর নাই। সযত্নে ইহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া অসীম আত্মতুষ্টি লইয়া নিজেদের অকৃতিত্বের শ্লাঘাকে দিকে দিকে জাহির করিয়া বাহাদুরী মারিয়াছ। এখন ইহাদিগকে অবিলম্বে আপন করিতে হইবে। লামডিংএ তোমরা জাতি-সৃষ্টির সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছ, যেই জাতি বীর্য্যবান্ অনমনীয়, বর্দ্ধিষ্ণু, সেই জাতি তোমরা সৃষ্টি করিবে বলিয়াছ। যে জাতির একটী মানুষও ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত নহে, যে জাতির প্রত্যেকটী মানুষ স্বোপার্জ্জিত অন্নে শরীর ধারণ করিয়া জগৎকল্যাণে আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত, যে জাতির যুবক যুবতীরা চাকুরী নকরীর জন্য দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়া বেড়ায় না, আত্মবল-প্রবুদ্ধ, আত্মবশ, স্বাবলম্বী এবং পরমুখাপেক্ষা-বর্জ্জনকারী, সেই জাতি তোমরা সৃষ্টি করিবে।

ইহাই যদি তোমাদের সঙ্কল্প হইয়া থাকে, তবে একটী প্রাণীরও ত' বসিয়া থাকিবার অধিকার নেই।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমি "অভিক্ষা" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলাম। গণ্যমান্য মহৎ জনের অনেকে বলিয়াছেন, ইহা আমার অহঙ্কারের বিজৃম্ভন। কিন্তু আজ খবরের কাগজের মোটা মোটা শিরোনামাগুলি পড়। দেখিবে, একজন তুচ্ছ স্বরূপানন্দ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে কথা দুঃসাহস করিয়া লেখনীমুখে, বক্তৃতামঞ্চে, নিজ জীবনের আচরণে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন, আঠারো বৎসর দেশ শাসনকার্য্য পরিচালনার পরে ছোট-বড় সকল নেতারা একমাত্র তাঁহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। যুদ্ধ করিয়া যদি ইঁহারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে আজিকার স্বাবলম্বনের বুদ্ধি আরও পনর বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের মগজে ঢুকিতে পারিত। বুদ্ধিমান ইংরেজের দয়াদত্ত দানে স্বাধীনতা পাইয়া ইঁহারা ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবীর সবগুলি জাতি ইহাদিগকে দয়া এবং অনুগ্রহ করিবার জন্যই জন্মিয়াছে। নেতৃত্বের অহমিকায় সমগ্র জাতিটাকে ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নির্দ্দয় ভাবে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বক্ষণে ইঁহাদের হঠাৎ আজ মনে হইয়াছে, স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কিন্তু নিজেরা যাহারা জীবনে ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে দেশ-সেবা বা আন্দোলন পরিচালনের শিক্ষা অর্জ্জন করেন নাই, তাঁহারা জাতিকে স্বাবলম্বনের সুনিশ্চিত সিদ্ধি-পথ দেখাইতে পারিবেন ত'? পারিলে ভাল। কিন্তু ধান্য লেভির যেই নমুনা লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহাতে দূরশ্রুতি-সম্পন্ন কেহ কেহ আসন্ন মন্বন্তরের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া যে আতঙ্কিত





হইয়াছেন, একথাও মিথ্যা নয়। স্বাবলম্বনই জাতির এখন বাঁচিবার একমাত্র পথ। অতীতেও স্বাবলম্বনই জাতির বাঁচিবার পথ ছিল কিন্তু সে পথ কেহ গ্রহণ করে নাই। ভবিষ্যতেও স্বাবলম্বনই জাতির বাঁচিবার একমাত্র পন্থা থাকিবে। কিন্তু সেই পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ শক্তিমান কেহ পরবশ্যতার আপোষ-রফার সহিত গাঁটছড়া বাঁধিবেন কি না, ইহা সম্পূর্ণই অনিশ্চিত।

তোমরা জাতি-সৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়াছ। মহাজাতি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতেই হইবে। রণদুর্দ্ধর্ষ, বীর্য্যবরীয়ান্, শক্তি-সম্ভারে সমৃদ্ধ, শৌর্য্যশালী জাতির জনক এবং জননী তোমরা হও। খণ্ডিত ভারতস্রষ্টার বা খণ্ডিত পাকিস্থান স্রষ্টার মহিমা অপেক্ষা তোমাদের মহিমা উন্নততর এবং অধিকতর গৌরবোজ্জল হউক। মহাত্মা গান্ধী বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির ইতিহাসে শেষ কথা নহে। কায়েদে আজম মিঃ জিন্নার সৃষ্টির পরেই সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টিশক্তি নির্ব্বাণ পাইয়াছে, ইহাও নহে। অতীতে যদি মহতেরা আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মহত্ত্ব নমস্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মহত্তর সৃষ্টির কারণ তোমরা হও। আমি জীবনে একটী স্বপ্ন দেখিয়াছি, দুইটী নহে, পাঁচটী নহে, দশটী নহে। সেই একটীমাত্র স্বপ্ন আমাকে আমার আট বছর বয়স হইতে আজ এই পরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত একই দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি বারংবার লক্ষ্য-পরিবর্ত্তন করি নাই। আবাল্য একনিষ্ঠায় আমি একটী ব্রতকেই ধরিয়া রাখিয়াছি। "শিক্ষায় স্বাধীনতা" এই কথার

অর্থ শিক্ষায় স্বাবলম্বন। "শিক্ষায় স্বাবলম্বন" এই কথার অর্থ "জীবনচর্য্যায় স্বাবলম্বন"। "জীবন-কর্ম্মে স্বাবলম্বন" এই কথার অর্থ ভবিষ্যৎবংশীয়দের জন্যে স্বাবলম্বনের উন্মুক্ত উদার, অবাধ ও অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, সুপ্রচুর সুযোগ রচনা করা। দশ বছরে আর বিশ বছরে আমি আমার স্বপ্নের শেষ করিতে চাহি না, আমার স্বপ্নের পর্য্যবসান তিন শত বৎসরের পরে।

তোমরা যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস কর, তাহারা আর একজনেও একটী নিমেষের জন্যও সময় নষ্ট করিও না। সময় নষ্ট করা আর আত্মহত্যা করা এক কথা জানিও। কুলীমজুররা আসিয়া গিয়াছে। এখনই আমাকে ছুটিয়া রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজে লাগিতে হইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরে আবার তোমাদের পত্রের উত্তর দিব। শরীর আমার একটু ভাল হইয়াছে। এই সুযোগটুকু আমি নিতে চাই। তোমরা সকলে জাগ্রত থাকিলে আমি আরও কিছুকাল শরীরকে বিশ্রাম দিতাম, কিন্তু দেওয়া গেল না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

**স্বরূপানন্দ**

**দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত**





নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

৯৭। দেশ, জাতি, ধর্ম্ম মানুষে মানুষে যত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, সব দূর করিবার উপায় স্বীকৃতি, গ্রহণ ও প্রেম।

৯৮। গৃহী হইলেই কেহ পচিয়া যায় না, সন্ন্যাসী হইলেই কেহ স্বর্গ পায় না। বাসনার বন্ধন হইতে মুক্ত হও, তাহা হইলেই তোমার জীবন সন্ন্যাসীর জীবন হইবে।

৯৯। মন লাগাইয়া রাখ নামে। হাত লাগাইয়া রাখ কাজে। বিরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।

১০০। মৃত্যুকে যে চিনিয়াছে, অমৃতত্বকে সে পাইয়াছে।

১০১। যতক্ষণ সত্যভ্রষ্ট না হইতেছ, ততক্ষণ জগতের কাহাকেও ভয় করিবার তোমার কিছু নাই।

১০২। সংসারী হও, সন্ন্যাসী হও, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লইয়া তোমার সংসার।

১০৩। ভগবানকে যে আপন করিয়াছে, ত্রিজগতে তাহার অপ্রাপ্য কি?

১০৪। নামে থাক লগ্ন, বিশ্বকে কর শুভময়।

১০৫। তোমার শক্তি তোমার ভক্তিতে। তোমার জীবনের সার্থকতা তোমার সেবায়, তোমার আত্ম-প্রচারহীন কর্ম্মকুশলতায়।



১০৬। ভক্তের প্রথমে মরে অহঙ্কার, তারপরে যায় মৃত্যুভয়।

১০৭। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ভয় থাকা পর্য্যন্ত নিজেকে ভক্ত বলিয়া জাহির করা আর "ভক্তি" কথাটাকে গালি দেওয়া এক কথা।

১০৮। পাপাচ্ছন্ন মন সুখনিদ্রার বিঘাতক।

১০৯। অর্থকে ঘৃণাও করিও না, তাহার প্রতি লালচও রাখিও না।

১১০। আনন্দহীন উন্নতি অধোগতিরই নামান্তর।

১১১। নিরুদ্বেগ নিত্যানন্দরসপূর্ণ প্রশান্ততার উচ্ছল-কেলি-ঘন সুন্দর জীবনই তোমার পরম কাম্য।

১১২। শ্রীভগবান শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপে তোমার নিত্যসঙ্গী।

১১৩। সঞ্চয় করিবে ধনলোভ বর্জ্জন করিয়া; খরচ করিবে অপব্যয় পরিহার করিয়া।

১১৪। যেই ভালবাসায় স্বার্থ নাই, সেই ভালবাসা বিশ্বকে জয় করিতে পারে।

১১৫। ভালবাস কিন্তু নিষ্কাম হইয়া, নিঃস্বার্থ হইয়া, নিষ্পাপ হইয়া। এই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা।

১১৬। শিক্ষার মূল কথা দূরদৃষ্টির, চিন্তার ও হৃদয়ের সম্প্রসারণ।



১১৭। পরার্থে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য যে নিরন্তর আকুলতা, তাহারই নাম যৌবন।

১১৮। যে সংসারে স্বামি-পত্নী উভয়েই প্রেমিক-প্রেমিকা, কামুক-কামুকী নহে, সেই সংসারই সাধুর সংসার, ধর্ম্মের সংসার, সত্যযুগের সংসার।

১১৯। যে দম্পতি যত পবিত্র, লোকের কাছে কথা বলিবার তাহাদের তত বেশী অধিকার।

১২০। অসৎ কার্য্যে প্রতিযোগিতা সর্ব্বনাশের হেতু আর সৎকার্য্যে প্রতিযোগিতা অভ্যুদয়ের সেতু।

১২১। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, ওলাউঠা প্রকাশ্য ভাবে যে ক্ষতি করিতেছে, জাতির ব্রহ্মচর্য্যহীনতা অপ্রকাশ্য ভাবে তাহার শতগুণ অকল্যাণ করিতেছে।

১২২। সবারে ডাকিয়া আনরে তোদের সাথে,
আনরে ধরিয়া তাদের চরণে হাতে,
তারা যেন আজ হরিনামে প্রেমে মাতে।

১২৩। সবারে মিলাও সবার সাথে
সবারে করহ সবার প্রাণ,
সবার কণ্ঠে দিবস রাতে
জাগুক মধুর প্রণব-গান।

১২৪। ভগবৎ-পরায়ণতাই সকল সার্থকতার মূল।



১২৫। ভগবানের নাম সকল অমৃতের খনি, সকল অভয়ের আকর, সকল সৌভাগ্যের সমুদ্র।

১২৬। চরিত্রহীন জাতি পৃথিবীর ভার-স্বরূপ। চরিত্রহীন পুরুষ নারীর আতঙ্ক। চরিত্রহীন নারী ধ্বংসের অগ্রদূতী।

১২৭। ঈশ্বর-প্রেম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস চরিত্রের উন্নতি-সাধনের সব চেয়ে বড় সহায়।

১২৮। সংসারকে নিজের সংসার না ভাবিয়া পরমেশ্বরের সংসার ভাবিতে হইবে।

১২৯। কর্ত্তব্য-সমূহকে দায় মনে না করিয়া ঈশ্বর-সেবা জানিতে হইবে।

১৩০। বিচ্ছিন্নতার মত শত্রু নাই, সঙ্ঘবদ্ধতার মতন শক্তি নাই।

১৩১। মানুষকে ধ্বংস করিতে কুকার্য্যের শক্তি যতখানি, কুচিন্তার শক্তি তাহা অপেক্ষা একটুকুও কম নহে।

১৩২। জীবনের পরম লক্ষ্য ঈশ্বর-দর্শন।

১৩৩। জীবনের পরমা শান্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে।

১৩৪। পরমেশ্বরকে আত্মময় দেখিয়া নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডময় দর্শনই ভারতীয় জীবনের পরম পুরুষার্থ।

১৩৫। ভগবন্মুখ হইলেই মানুষ অন্তর্ম্মুখ হয়, তাহার বিলাস-লিপ্সা ও সম্ভোগ-লালসা অন্তর্হিত হয়।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "কুমারীর পবিত্রতা" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "বিধবার-জীবনযজ্ঞ" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা' ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী -২২১০১০

ISBN 978-81-957962-5-0
9 788195 796250 >

# ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

দ্বাবিংশ খণ্ড